وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (آل عمران-১০৩)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (المستدرك للحاكم-৩১৮)

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

মাসিক আল-ইতিছাম

الاعتصام

আবূ হুরায়রা ﵁ বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘আল্লাহর ক্বসম! সে ব্যক্তি মুমিন নয়। আল্লাহর ক্বসম! সে ব্যক্তি মুমিন নয়। আল্লাহর ক্বসম! সে ব্যক্তি মুমিন নয়’। জিজ্ঞেস করা হলো, সে কোন ব্যক্তি, হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, ‘যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ নয়’ (ছহীহ বুখারী, হা/৬০১৬; মিশকাত, হা/৪৯৬২)।

● ৬ষ্ঠ বর্ষ ● ৩য় সংখ্যা ● জানুয়ারি ২০২২

Web : www.al-itisam.com

৬ষ্ঠ বর্ষ
৩য় সংখ্যা
জানুয়ারি-২০২২
পৌষ-মাঘ ১৪২৮
জুমাঃ উলা- জুমাঃ সানী
১৪৪৩

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মাসিক আল-ইতিছাম

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

প্রধান সম্পাদক

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

সার্বিক সম্পাদনায়

আল-ইতিছাম গবেষণা পর্ষদ

সার্বিক যোগাযোগ

মাসিক আল-ইতিছাম

- প্রধান সম্পাদক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী; তুবা পুস্তকালয়, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
- সম্পাদনা বিভাগ : ০১৪০৭-০২১৮৩৮
- ব্যবস্থাপনা বিভাগ : ০১৪০৭-০২১৮৩৯
- সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭৫০-১২৪৪৯০, ০১৪০৭-০২১৮৪১
- ফাতাওয়া হটলাইন : ০১৪০৭-০২১৮৪২ (বিকাল ৪:০০মি.-৫:৩০মি.)
- ই-মেইল : monthlyalitisam@gmail.com
- ওয়েবসাইট : www.al-itisam.com
- ফেসবুক পেজ : facebook.com/alitisam2016
- ইউটিউব : youtube.com/c/alitisamtv

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

- জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ : ০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮ , ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯
- জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী : ০১৭৮৭-০২৫০৬০ , ০১৭২৪-৩৮৪৮৫৫
- জামি'আহর উভয় শাখার জন্য : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ , ০১৭১৭-৯৪৩১৯৬
- জামি'আহর সার্বিক কাজে সহযোগিতা করতে : বিকাশ পারসোনাল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ বিকাশ মার্চেন্ট : ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭

হাদিয়া

২৫/- (পঁচিশ টাকা) মাত্র

বার্ষিক নতুন গ্রাহক চাঁদা	ষাণ্মাসিক	বাৎসরিক
সাধারণ ডাক	২০০/-	৪০০/-
কুরিয়ার সার্ভিস	৩০০/-	৬০০/-

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ কর্তৃক প্রকাশিত এবং আল-ইতিছাম প্রিন্টিং প্রেস, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ০২

প্রবন্ধ

» হজ্জ ও উমরা (পর্ব-১৭) ০৩
-আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

» লোক দেখানো আমলের পরিণতি (শেষ পর্ব) ০৭
-ড. ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর

» মহানবী মুহাম্মাদ ﷺ : উম্মাহর পাওয়া শ্রেষ্ঠ উপহার ১১
-ড. মো. কামরুজ্জামান

» হক্কের মানদণ্ড ১৩
- মূল (উর্দূ) : সাইয়্যেদ মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী (রাহিমাহুল্লাহ)
অনুবাদ : আখতারুজ্জামান বিন মতিউর রহমান

» জ্ঞানীদের কিছু গুণাবলি ১৬
- মো. তরিকুল ইসলাম

» একটি লিফলেটের ইলমী জবাব (শেষ পর্ব) ১৯
-আহমাদুল্লাহ

» মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার ১০টি উপায়! ২২
-আত্তাউর রহমান

» মাধ্যমিক স্তরে মানসম্মত শিক্ষাবিস্তারে প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা ২৫
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)
- মো. আরিফুল ইসলাম

» মূর্খদের সাথে বিতর্ক : শরীআত কী বলে? (পূর্ব প্রকাশিতের পর) ২৭
-অধ্যাপক ওবায়দুল বারী বিন সিরাজউদ্দীন

» কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মৃত মুসলিমদের জন্য নিবেদিত আমলসমূহের প্রতিদান ২৯
-মূল : ড. সাঈদ ইবনু আলী ইবনু ওয়াহাফ আল-ক্বাহত্বানী (হাফিযাহুল্লাহ)
অনুবাদ : হাফীযুর রহমান বিন দিলজার হোসাইন

হারামাইনের মিম্বার থেকে

» ঐক্যবদ্ধ থাকুন, মতানৈক্য পরিহার করুন ৩১
-অনুবাদ : মো. তরিকুল ইসলাম

সাময়িক প্রসঙ্গ

» হাফ ভাড়া শিক্ষার্থীদের আবদার, না-কি অধিকার? ৩৫
-জুয়েল রানা

দিশারী

» প্রজেক্টর নিয়ে কিছু কথা ৩৭
-সাঈদুর রহমান

কবিতা ৪০

বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক ৪১

সওয়াল-জওয়াব ৪৩

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ঈমান নিয়ে ছিনিমিনি খেলবেন না!

গত ৬ ডিসেম্বর ২০২১ সোমবার বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোরের প্রধান সম্পাদক তৌফিক ইমরোজ খালিদী শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনির শিক্ষাক্রমের পরিবর্তন বিষয়ক একটি সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন। যেখানে চতুর্থ থেকে অষ্টম এই পাঁচ বছরে ধর্মশিক্ষা, ভালো থাকা, শিল্প এবং সংস্কৃতি পাঠ্যক্রমে যুক্ত করার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে উঠে আসে। শিক্ষামন্ত্রীকে একটি প্রশ্ন করা হয় এভাবে— 'পরমতসহিষ্ণুতা যেটা আপনারা সমাজে প্রমোট করতে চান, সেটার জন্যে আপনার কী মনে হয় না, সবারই কম বেশি অন্য ধর্ম সম্পর্কে জানা উচিত? সেটা কী করবেন আপনারা?' উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'অবশ্যই। আমিতো চাই... আমিতো আশা করছি সেটা করা হবে। প্রত্যেকটি ছাত্র-ছাত্রীকে অন্য ধর্ম সম্পর্কেও জানতে হবে। একটা হচ্ছে, নিজের ধর্ম চর্চা, সেটা একটা জায়গা। আরেকটা হচ্ছে, ধর্মীয় শিক্ষা'।

আমরা বলতে চাই, গত নভেম্বর ২০২১ সংখ্যায় ইসলামে ধর্মীয় উদারতার উপর সম্পাদকীয়তে আমরা লিখেছিলাম, 'ইসলামের মতো আর কোনো ধর্ম অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে উদারতা ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করতে পারেনি। এমনকি যুদ্ধেও নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও বেসামরিক নিরপরাধ নাগরিকের উপর হামলা করতে ইসলাম নিষেধ করেছে। অনুরূপভাবে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি নষ্ট করাও নিষেধ। সেজন্য মুসলিমদের হৃদয়ে অন্যদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ, ক্রোধ, প্রতারণা লুক্কায়িত থাকে না। বরং একজন মুসলিম ইসলামের ন্যায়পরায়ণতা, সমতা, অঙ্গীকার রক্ষা, দয়ার্দ্রতা ও নিরাপত্তা দ্বারা সকল মানুষের সাথে চলে। তবে এক্ষেত্রে সে ইসলামী আক্বীদা ও আচার-অনুষ্ঠানের অপমান বরদাশত করে না'। জি, ঠিক তাই; আমরা ইসলামের নির্দেশনা মোতাবেক ধর্মীয় উদারতা ও সহিষ্ণুতা দেখাতে মোটেও কার্পণ্য করি না। কিন্তু তাই বলে অন্য কোনো ধর্ম ও মতাদর্শ পড়ে সেটা আমাদেরকে শিখতে হবে— ব্যাপারটা মোটেও সে রকম নয়। বরং ইসলামেই রয়েছে এর সব রসদ। কোমলমতি মুসলিম শিক্ষার্থী যখন অন্য ধর্মের মতাদর্শ পড়বে, তখন নিজের অজান্তেই সে চোরাবালিতে তলিয়ে যাবে। তার কচি হৃদয়ের গহীন কোণে ইসলাম সম্পর্কে নানা বিভ্রাট ও সংশয় বাসা বাঁধবে। তার মধ্যে জন্মাবে অন্য ধর্ম, মতাদর্শ ও এর ধ্বজাধারীদের প্রতি ভালোবাসা, যা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ *(মুমতাহিনাহ, ৬০/৪; মায়েদাহ, ৫/৫১)*। এক সময় সে ঈমান-আমল খোয়াবে। মনে রাখতে হবে, আমাদের সকলের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর নিকট ইসলামই একমাত্র মনোনীত জীবনবিধান *(আলে ইমরান, ৩/১৯)*। ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম মহান সৃষ্টিকর্তা কস্মিনকালেও গ্রহণ করবেন না *(ঐ, ৩/৮৫)*।

বস্তুত একজন মুসলিমের আক্বীদা-আমলে সামান্যতম চিড় ধরাতে পারে এমন কোনো কথা শোনা ও পড়া কখনই জায়েয নেই এবং এ ব্যাপারে কোনো যুগের মুসলিম স্কলারগণের মধ্যে দ্বিমত পাওয়া যায় না। সেকারণে ছোট ছেলে-মেয়েরা তো দূরে থাক, এমনকি বয়স্ক মুসলিমেরও এমন কোনো লেখা পড়া যাবে না বা বক্তব্য শোনা যাবে না, যা তাদের ঈমান ও আমলে বিন্দুমাত্র বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। দ্বিতীয় খলীফা উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কোনো এক আহলে কিতাবের নিকট থেকে তাদের কোনো একটি কিতাব পান এবং তা তিনি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এনে পাঠ করেন। এতে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভীষণ রাগ করেন *(আহমাদ, হা/১৫১৫৬, 'হাসান')*। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, 'সে সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! ইয়াহূদী হোক আর খ্রিষ্টান হোক, যে ব্যক্তিই আমার এ আহ্বান শুনেছে, অথচ আমার রিসালাতের উপর ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করেছে, অবশ্যই সে জাহান্নামী' *(মুসলিম, হা/২৪০)*। অবশ্য প্রয়োজনে অন্যান্য মতাদর্শের ভ্রান্তি ও অসারতা তুলে ধরার উদ্দেশ্যেই কেবল সে সম্পর্কে পড়াশুনা করা যাবে। তবে সেক্ষেত্রেও শক্ত শর্ত মানতে হবে; তা হচ্ছে, হক্ব ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করার মতো পরিপক্ক জ্ঞান ব্যক্তির মধ্যে থাকতে হবে এবং নিজে ফেতনা ও বিভ্রাটে পড়ে যাওয়ার সব রকমের ঝুঁকিমুক্ত হতে হবে। তাই যদি হয়, তাহলে কচিকাচা শিক্ষার্থীদের জন্য অন্য ধর্মের জ্ঞান অর্জন কতটুকু নিরাপদ হতে পারে, যাদের ঈমান-আমলের জ্ঞান একদম শূন্যের কোঠায়?! আমরা মনে করি, ইসলামে ধর্মীয় উদারতা সম্পর্কে মুসলিম শিক্ষার্থীদেরকে পূর্ণ ওয়াকিফহাল করাই যথেষ্ট; উদার বানানোর লক্ষ্যে অন্য ধর্মের জ্ঞান তাদের মোটেও দরকার নেই।

পরিশেষে, ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করার কারণে আমরা সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। সাথে সাথে আবেদন জানাই: (১) ধর্মীয় শিক্ষাকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত শুধু নয়, বরং অন্তত উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বাধ্যতামূলক করুন। (২) তবে ইসলাম শিক্ষায় যেন অবশ্যই পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক খাঁটি জ্ঞান স্থান পায়, সেদিকে গুরুত্বের সাথে নজর রাখুন। (৩) বাংলাদেশের মতো একটি মুসলিমরাষ্ট্রে ডারউইনের বিবর্তনবাদ তত্ত্বের মতো আরো যেসব নাস্তিক্য মতবাদ পাঠ্যবইয়ে স্থান পেয়েছে, সেগুলো অবিলম্বে সরিয়ে ফেলুন। (৪) কোনোভাবেই যেন সেক্যুলারিজম আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতিতে বিষদাঁত বসাতে না পারে, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখুন। মহান আল্লাহ আমাদের ঈমান-আমল রক্ষা, অতঃপর দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

হজ্জ ও উমরা

-আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

(পর্ব-১৭)

চুল কেটে হালাল হতে হবে : উমরার কাজ প্রায় সবই শেষ। এখন মাথার চুল কেটে ইহরাম হতে হালাল হতে হবে। এটা উমরার একটি ওয়াজিব কাজ। যারা ক্বেরান অথবা ইফরাদ হজ্জের ইহরাম বাঁধবে তারা মাথার চুল কাটাতে পারবে না। তারা হজ্জের দিন পাথর মারার পর মাথার চুল কাটাবে বা ন্যাড়া করাবে। পুরুষরা চুল ছোট করে অথবা ন্যাড়া করে হালাল হতে পারে। তবে মাথা ন্যাড়া করা উত্তম। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ন্যাড়ার জন্য তিন বার আর ছোটকারীর জন্য এক বার দু'আ করেন। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ وَلِلْمُقَصِّرِينَ.

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আল্লাহ! মাথা ন্যাড়াকারীকে ক্ষমা করো। ছাহাবীগণ বললেন, যারা চুল ছোট করেছে তাদের জন্য। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আল্লাহ! যারা মাথা ন্যাড়া করেছেন, তাদের ক্ষমা করো। ছাহাবীগণ বললেন, যারা মাথার চুল ছোট করেছে তাদের জন্য। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এভাবে তিন বার বললেন। আর তৃতীয় বা চতুর্থ বার বললেন, যারা চুল ছোট করেছে তাদেরও ক্ষমা করো।[১] তবে উমরা করেই যদি কিছুদিনের মধ্যে হজ্জ শুরু হয়, তাহলে ১০ তারিখে যেন মাথা ন্যাড়া করা যায় এজন্য ন্যাড়া না করে চুল ছোট করাই উত্তম। যেমন ছাহাবীগণ বিদায় হজ্জের সময় করেছিলেন।[২]

মহিলারা তাদের মাথার চুলের শেষ দিক হতে কিছু পরিমাণ কেটে ফেলবে। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মহিলাদের মাথার চুল ন্যাড়া করতে হবে না। তাদের মাথার চুল ছোট করতে হবে'।[৩]

একজন অন্যজনের চুল কেটে দিতে পারে। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমাকে মুআবিয়া রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেছেন, আমি একটি কাঁচি দিয়ে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর চুল ছোট করে দিয়েছিলাম।[৪] এভাবে উমরা হতে হালাল হয়ে যুলহিজ্জার আট তারিখের জন্য অপেক্ষা করবে। অতঃপর আট তারিখে হজ্জের জন্যে নতুন করে ইহরাম বাঁধবে।

যিলহজ্জ মাসের আট তারিখে হজ্জের ইহরাম এবং মিনায় গমন : যিলহজ্জ মাসের আট তারিখ যাকে 'ইয়াওমুত তারবিয়্যা' বলা হয়, সে দিন সকালে আপন আপন স্থানে এবং মক্কাবাসী আপন বাসায় পূর্বের মতো ইহরামের প্রস্তুতি নিয়ে অন্তরে হজ্জের নিয়্যত করবে, অতঃপর মুখে বলবে, (لَبَّيْكَ حَجًّا) 'লাব্বাইকা হাজ্জান'। এ বলে হজ্জের ইহরাম বাঁধবে এবং মিনার দিকে রওয়ানা হবে। এর আগে গোসল করে নিবে। সম্ভব হলে আতর ব্যবহার করবে। ইহরামের পোশাক পরিধান করবে। 'লাব্বাইকা হাজ্জান' বলার পর তালবিয়্যা পড়তে থাকবে, যে তালবিয়া হজ্জের দিন ১০ তারিখ বড় জামরায় পাথর মারা পর্যন্ত চলতে থাকবে। তারপর মিনায় গিয়ে যোহর, আছর, মাগরিব, এশা ক্বছর করে এবং ৯ তারিখের ফজর ছালাত যথারীতি নির্দিষ্ট ওয়াক্তে আদায় করবে। ফজরের ছালাত শেষে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর মিনা থেকে আরাফার মাঠে যাবে।[৫] ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের নিয়ে মিনায় যোহর, আছর, মাগরিব, এশা এবং ফজরের ছালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি আরাফায় গেলেন।[৬] ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সাথে মিনায় দুই রাকআত ক্বছর ছালাত আদায় করেছি।[৭] এখানে মক্কাবাসীদেরও ক্বছর ছালাত আদায় করতে হবে। কেননা, এটা হজ্জের বিধান।

জ্ঞাতব্য : কোনো প্রয়োজনে বা কোনো সমস্যার কারণে সাত তারিখ দিবাগত রাতে মিনায় যেতে হলে ইহরাম বেঁধে যেতে হবে।

যা বর্জন করতে হবে :

(১) মিনায় যাওয়ার পূর্বে ১০ তারিখের অগ্রিম সাঈ করা।

(২) নিজ বাসা থেকে ইহরাম না বেঁধে, কা'বাঘরে গিয়ে ইহরাম বাঁধা।

(৩) ইহরামের বাক্য ও তালবিয়া ছাড়া মনগড়া কোনো দু'আ-দরূদ পড়া।

১. হীহ বুখারী, হা/১৭২৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১৩০২।
২. হীহ বুখারী, হা/৪৪১১; মিশকাত, হা/২৬৩৬।
৩. আবূ দাঊদ, হা/১৯৮৫; হাদীছ ছহীহ; মিশকাত, হা/২৬৫৪।
৪. হীহ বুখারী, হা/১৭৩০; ছহীহ মুসলিম, হা/১২৪৬।
৫. বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা, হা/৯৫০২।
৬. তিরমিযী, হা/৮৭৯, হাদীছ ছহীহ।
৭. ছহীহ বুখারী, হা/১০৮২; তিরমিযী, হা/৮৮২, হাদীছ ছহীহ।

আরাফায় অবস্থান : হাদীছে এসেছে,

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ كَانَ يُهِلُّ مِنَّا الْمُهِلُّ فَلاَ يُنْكِرُ عَلَيْهِ ، وَيُكَبِّرُ مِنَّا الْمُكَبِّرُ فَلاَ يُنْكِرُ عَلَيْهِ.

মুহাম্মাদ ইবনু আবূ বকর আছ-ছাক্বাফী হতে বর্ণিত আছে, তিনি একবার আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে জিজ্ঞেস করলেন, তখন তারা উভয়ে ভোর বেলায় মিনা হতে আরাফাতের দিকে যাচ্ছিলেন, আপনারা এই দিনে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে কী করতেন? তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে যে 'তালবিয়্যা' বলতে চাইত তালবিয়্যা বলত, অথচ তার প্রতি কোনো আপত্তি করা হতো না। এভাবে আমাদের মধ্যে যে তাকবীর বলতে চাইত, সে তাকবীর বলত, অথচ তাতে তার প্রতি কোনো আপত্তি করা হতো না।[৮]

عَنْ جَابِرٍ فِي حَدِيثِهِ ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَحَرْتُ هَا هُنَا وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ وَوَقَفْتُ هَا هُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَوَقَفْتُ هَا هُنَا وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ.

জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'আমি এই জায়গায় কুরবানী করেছি। আর পুরো মিনা এলাকা কুরবানীর জায়গা। সুতরাং তোমরা তোমাদের আবাসে কুরবানী করো। আমি ঐ স্থানে অবস্থান করেছি আর পুরো আরাফার মাঠ অবস্থানের স্থল। আমি এই জায়গায় অবস্থান করেছি। আর গোটা মুযদালিফা অবস্থানের জায়গা'।[৯]

عَنْ عَائِشَةَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمِ الْمَلاَئِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلاَءِ.

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'আরাফার দিন ছাড়া এমন কোনো দিন নাই যে দিনে আল্লাহ তাআলা আপন বান্দাদের জাহান্নাম হতে অধিকহারে মুক্তি দিয়ে থাকেন। তিনি সেদিন তাদের অতি নিকটবর্তী হন এবং তাদের নিয়ে ফেরেশতাদের নিকট গর্ব করেন এবং বলেন, তারা কী চায় বলো? (আমি তাদের তাই দিব)'।[১০]

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ خَالٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ يَزِيدُ بْنُ شَيْبَانَ قَالَ كُنَّا فِيْ مَوْقِفٍ لَنَا بِعَرَفَةَ يُبَاعِدُه عَمْرٌو مِنْ مَوْقِفِ الإِمَامِ جِدًّا فَأَتَانَا ابْنُ مِرْبَعٍ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ إِنِّيْ رَسُولُ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَيْكُمْ يَقُولُ لَكُمْ قِفُوْا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

আমর ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু ছাফওয়ান তার এক মামা হতে বর্ণনা করেন, যাকে ইয়াযীদ ইবনু শায়বান বলা হতো। ইয়াযীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা আরাফাতে আমাদের পূর্বপুরুষদের স্থানে ছিলাম। আমর বলেন, এ স্থানটি ইমামের স্থান হতে অনেক দূরে ছিল। ইয়াযীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এমন সময় আমাদের কাছে ইবনু মিরবা আল-আনছারী এসে বলেন, আমি তোমাদের কাছে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পক্ষ হতে প্রেরিত প্রতিনিধি। তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমাদেরকে তোমাদের অবস্থানেই (ইবাদতগারে) থাকার জন্য বলেছেন। কারণ তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর সুন্নাতের উপরে রয়েছ।[১১]

عَنْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ وَكُلُّ الْمُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ.

জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'আরাফার সম্পূর্ণ স্থানই অবস্থানস্থল, মিনার সম্পূর্ণ স্থানই কুরবানীর স্থান, মুযদালিফার সম্পূর্ণটাই অবস্থানস্থল এবং মক্কার সকল পথই রাস্তা ও কুরবানীর স্থান'।[১২]

عَنْ خَالِدِ بْنَ هَوْذَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ عَلَى بَعِيرٍ قَائِمًا فِي الرِّكَابَيْنِ.

খালেদ ইবনু হাওদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে আরাফার দিনে একটি উটের উপর দু'পাদানীতে পা রেখে ভাষণ দিতে দেখেছি।[১৩]

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

আমর ইবনু শুআইব তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'দু'আর মধ্যে শ্রেষ্ঠ দু'আ হলো আরাফার দিনের দু'আ এবং সর্বোত্তম যিকির যা আমি পাঠ করেছি ও আমার পূর্ববর্তী নবীগণ পাঠ করেছেন তা হলো, *'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু লাহুলমুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শায়ইন কাদীর'*। অর্থ : 'আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বূদ নাই।

৮. ছহীহ বুখারী, হা/১৬৫৯; ছহীহ মুসলিম, হা/১২৮৫; মিশকাত, হা/২৫৯২।
৯. ছহীহ মুসলিম, হা/১২১৮; মিশকাত, হা/২৫৯৩।
১০. ছহীহ মুসলিম, হা/১৩৪৮; মিশকাত, হা/২৫৯৪।
১১. আবূ দাঊদ, হা/১৯১৯, হাদীছ ছহীহ; মিশকাত, হা/২৫৯৫।
১২. আবূ দাঊদ, হা/১৯৩৭, হাদীছ ছহীহ; মিশকাত, হা/২৫৯৬।
১৩. আবূ দাঊদ, হা/১৯১৭; মুসনাদে আহমাদ, হা/২০৩৫০, হাদীছ ছহীহ; মিশকাত, হা/২৫৯৭।

তিনি অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরীক নাই, রাজত্ব তাঁরই। তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা, তিনি সবকিছু করতে সক্ষম'।[১৪]

জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'সম্পূর্ণ আরাফা অবস্থানের জায়গা। অতএব, বাত্বনে আরাফাত স্থান হতে চলে যাও। সম্পূর্ণ মুযদালিফা অবস্থানের জায়গা। অতএব, বাত্বনে মুহাসসার হতে চলে যাও। সম্পূর্ণ মিনা কুরবানীর স্থান'।[১৫] অতএব, নিয়ম হলো আরাফায় প্রবেশের আগে নামেরা প্রান্তরে উরানা উপত্যকায় অবস্থান করে সূর্য ঢলে গেলে যোহর ও আছরের ছালাত একসাথে এক আযানে ও দুই ইক্বামতে ক্বছর করে আদায় করে আরাফার সীমানায় প্রবেশ করবে। কিন্তু এত মানুষের পক্ষে সেভাবে সম্ভব হয়ে উঠবে না। ফলে মিনা হতে সরাসরি আরাফার সীমানায় যাওয়া হয়। আশা করা যায় যে, নিরুপায় অবস্থার কারণে কোনো সমস্যা হবে না। তবে কেউ যদি কাফেলা ছাড়াই একাকী হজ্জ করে, তাহলে প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিত। এখানে যোহর-আছরের আগে পরে কোনো সুন্নাত পড়বে না। কারণ, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোনো সফরে সুন্নাত পড়তেন না। তবে তিনি ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত সফরে পড়তেন। এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম যে, মিনা হতে সূর্য উদিত হওয়ার পর আরাফায় যেতে হবে। কিন্তু ভিড়ের কারণে সূর্য উদিত হওয়ার আগেই মিনা হতে আরাফার মাঠে নিয়ে যাওয়া হয়। যদি কাউকে নিরুপায় হয়ে যেতে হয়, তাহলে কোনো সমস্যা হবে না।

মূলত আরাফায় অবস্থান করাই হলো হজ্জ। কাজেই আরাফায় অবস্থান করা ফরয। আরাফায় অবস্থান ছুটে গেলে হজ্জ বাতিল বলে গণ্য হবে। আর সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় থাকা জরুরী। আব্দুর রহমান ইবনু ইয়া'মার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'আরাফাই মূলত হজ্জ। মুযদালিফার রাতে ফজরের সময় হওয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত কেউ যদি আরাফার মাঠে উপস্থিত হতে পারে, তাহলে তার হজ্জ হয়ে যাবে। আর মিনায় থাকার সময়সীমা হলো তিন দিন। যদি কেউ দুই দিন থেকে চলে যায় তার গুনাহ হবে না। আর যদি কেউ তিন দিন থাকে তাহলে তার গুনাহ হবে না'।[১৬]

উরওয়া ইবনু মুযাররিস আত-ত্বাঈ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, আমি মুযদালিফায় রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আসলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! 'ত্বায়ে' অবস্থিত একটি পাহাড়ের নিকট হতে এসেছি। আমার বাহন ক্লান্ত হয়ে গেছে। আমি নিজেও ক্লান্ত হয়েছি। আল্লাহর কসম! আমি এমন কোনো পাহাড় ছাড়িনি, যেখানে আমি অবস্থান করিনি (আমার ও বাহনের ক্লান্তির কারণে সব পাহাড়েই অবস্থান করতে হয়েছে)। এ অবস্থায় আমার হজ্জ সম্পূর্ণ হয়েছে কি? তখন রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের সাথে মুযদালিফায় ফজরের ছালাত আদায় করল এবং এ সময়ের পূর্বের দিনে বা রাতে আরাফাতে উপস্থিত হলো, সে তার হজ্জ পরিপূর্ণ করল এবং হজ্জের সমস্ত কাজ সম্পূর্ণ করল'।[১৭]

আরাফার দিন সূর্য ঢলা পর্যন্ত আরাফার মাঠে অবস্থান করলে ফরয আদায় হয়ে যাবে। তবে সূর্যাস্ত পর্যন্ত থাকতে না পারলে ওয়াজিব ছুটে যাবে। তখন কাফফারা দিতে হবে। আরাফার দিন সূর্য ঢলে যাওয়ার পর যোহর ও আছর এক আযানে এবং দুই ইক্বামতে যোহরের সময়ে ক্বছর করতে হবে। সম্ভব হলে ইমামের সাথে জামাআতে আদায় করবে। সম্ভব না হলে নিজ স্থানে যোহর-আছর এক সাথে ক্বছর আদায় করবে। কারণ এটাই নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাত এবং ছাহাবীগণের আমল। যোহর ও আছর নির্ধারিত সময়ে পূর্ণ ছালাত আদায় করা রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাত অমান্য করা।

জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, ثُمَّ أَذَّنَ بِلاَلٌ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا 'অতঃপর বেলাল আযান দিলেন। এরপর তিনি ইক্বামত দিলে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যোহরের ছালাত আদায় করালেন। আবার ইক্বামত দিলেন, তিনি আছরের ছালাত আদায় করালেন। তবে উভয় ছালাতের মাঝে কোনো সুন্নাত পড়লেন না'।[১৮]

রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উম্মত হয়ে তাঁর সুন্নাত বিরোধী কোনো আমল করা কোন মুসলিমের জন্য জায়েয নয়। আরাফার দিন ছিয়াম পালন করলে অনেক নেকী। তবে যারা হজ্জ পালন করতে এসেছে, তারা ছিয়াম পালন করতে পারবে না। হারেছের কন্যা উম্মুল ফাযল (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন, কিছু লোক রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরাফার দিন ছিয়াম অবস্থায় আছেন কি না, তাতে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাদের কেউ বলল, তিনি ছিয়াম আছেন। আর কেউ বলল, না, তিনি ছিয়াম নেই। এতে উম্মুল ফাযল (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) এক পিয়ালা দুধ রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে পাঠালেন। তখন রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা পান করলেন। এ

১৪. তিরমিযী, হা/৩৫৮৫, হাদীছ হাসান, তাহক্বীক : আহমাদ শাকের; মিশকাত, হা/২৫৯৮।

১৫. ইবনু মাজাহ, হা/৩০১২, হাদীছ ছহীহ।

১৬. তিরমিযী, হা/৮৮৯, হাদীছ ছহীহ, তাহক্বীক : আহমাদ শাকের; আবূ দাঊদ, হা/১৯৪৯; মিশকাত, হা/২৭১৪।

১৭. তিরমিযী, হা/৮৯১, হাদীছ ছহীহ, তাহক্বীক : আহমাদ শাকের; মুসনাদে আহমাদ, হা/১৮৩২৬; আবূ দাঊদ, হা/১৯৫০।

১৮. ছহীহ মুসলিম, হা/১২১৮; মিশকাত, হা/২৫৫৫।

সময় তিনি আরাফায় উটের উপর অবস্থান করছিলেন।[১৯] এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হজ্জ পালনকারীদের আরাফার দিন ছিয়াম পালন করতে হবে না। অতএব, যোহর এবং আছর এক আযানে ও দুই ইক্বামতে দুই রাকআত করে মোট চার রাকআত ক্বছর ছালাত যোহরের সময়ে আদায় করে আরাফার ময়দানে দু'আ-দরূদ, যিকির-আযকার ও তাসবীহ-তাহলীল এবং তালবিয়া পাঠে ব্যস্ত থাকা উচিত। মূলত, এটাই রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত।

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুমা বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সবচেয়ে উত্তম দু'আ হলো আরাফার দিনের দু'আ। আর সবচেয়ে উত্তম দু'আ যা আমি বলেছি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণ বলেছে তা হলো, لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ অর্থ : 'আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মা'বূদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই। প্রশংসা তাঁর। তিনিই সর্বশক্তিমান'।[২০]

উক্ত হাদীছসমূহ থেকে বুঝা যায়, এই দু'আটিসহ তালবিয়া বেশি বেশি পাঠ করতে হবে। কোনো ত্বরীক্বা বা বিশেষ কোনো পদ্ধতিতে দু'আ-দরূদ, যিকির-আযকার করা যাবে না; বরং একাকী কেবলামুখী হয়ে দুই হাত তুলে দু'আ করবে। উসামা ইবনু যায়েদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আমি আরাফার মাঠে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর পিছনে বসেছিলাম। তিনি তাঁর দুই হাত তুলে দু'আ করতে লাগলেন। ইতোমধ্যে তাঁর উটটি একটু সরে গেল। তখন তার লাগামটি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর হাত হতে পড়ে গেল। তিনি তাঁর এক হাত দিয়ে লাগামটি উঠিয়ে নিলেন এবং অপর হাতটি উঠানো ছিল।[২১] এই হাদীছ প্রমাণ করে আরাফার মাঠে হাত তুলে দু'আ করতে হবে। সম্ভব হলে জাবালে রহমতকে সামনে রেখে কেবলামুখী হয়ে দুই হাত তুলে দু'আ করবে। তবে গোটা আরাফাই অবস্থানের জায়গা। জাবের রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমি এখানে কুরবানী করলাম, গোটা মিনা কুরবানীর স্থান। তোমরা তোমাদের স্থানে কুরবানী করো। আমি এখানে অবস্থান করলাম। গোটা আরাফাই অবস্থানের জায়গা। আর আমি এখানে অবস্থান করলাম। গোটা মুযদালিফায় অবস্থানের জায়গা'।[২২] এসব স্থানে অবস্থান করতে হবে, তাসবীহ-তাহলীল, যিকির-আযকার করতে হবে ও তালবিয়া পাঠ করতে হবে।

যা করা নিষিদ্ধ :

(১) আরাফার জন্য বিশেষভাবে গোসল করা।

(২) বিভিন্ন ত্বরীক্বার অযীফা ও বানোয়াট দু'আ-দরূদ পাঠ করা।

(৩) জাবালে রহমত পাহাড়ে উঠা, পাথরে চুমু খাওয়া ও চেহারায় মালিশ করা।

(৪) জাবালে রহমতে ত্বাওয়াফ করা ও ছবি তোলা বা সেখানে কিছু লিখা।

(৫) খুৎবা শেষ হওয়ার পূর্বে ছালাত আদায় করা।

(৬) যোহর-আছর ছালাত এক সাথে আদায় না করে নির্ধারিত সময়ে ভিন্নভাবে আদায় করা।

(৭) যোহর-আছরের সুন্নাত বা অন্য কোনো নফল ছালাত আদায় করা।

(৮) অনর্থক গল্প-গুজবে লিপ্ত হওয়া।

(৯) বিশেষ পদ্ধতিতে মীলাদ ও যিকির করা।

(১০) সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফার ময়দান ত্যাগ করা।

(১১) আরাফার সীমান্তের বাইরে ঘোরাফেরা করা।

(চলবে)

---

১৯. ছহীহ বুখারী, হা/১৯৮৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১১২৩।

২০. তিরমিযী, হা/৩৫৮৫, হাদীছ হাসান; মিশকাত, হা/২৫৯৮।

২১. নাসাঈ, হা/৩০১১, সনদ ছহীহ; মুসনাদে আহমাদ, হা/২১৮৭০।

২২. ছহীহ মুসলিম, হা/১২১৮; মিশকাত, হা/২৫৯৩।

AT TAQWA STORE
01575-245872 @attaqwastore

খাঁটি ও নির্ভেজাল পণ্যের প্রচেষ্টায়। ইন শা আল্লাহ, আমাদের কাছে পাবেন,

- খাঁটি গাওয়া ঘি - ৬৫০ টাকা/ ৫০০ গ্রাম,
- সুন্দরবনের খলিশা মধু - ৪৫০ টাকা/ ৫০০ গ্রাম,
- কালিজিরা মধু (ধনিয়া মিক্স) - ৪৫০ টাকা/ ৫০০ গ্রাম,
- লিচু ফুলের মধু - ২৭৫ টাকা/ ৫০০ গ্রাম,
- লিচু কালোজিরা মিশ্র মধু - ৩২০ টাকা/ ৫০০ গ্রাম,
- কালোজিরার তেল - ১৮০ টাকা/ ১০০ মিলি,
- কাঠের ঘানিতে ভাঙ্গা সরিষার তেল (কোল্ড প্রেসড) - দাম জানতে কল করুন,
- সরিষার তেল (মেশিনে ভাঙ্গানো) - দাম জানতে কল করুন,
- খেজুরের গুড় (সিজনাল),
- আম (সিজনাল),
- নির্ভরযোগ্য লেখকদের ইসলামিক বই।

কুরিয়ার চার্জ ফ্রী

অর্ডার করতে কল করুন ০১৩২১৪৪৭৫৭৫, হোয়াটসঅ্যাপ ০১৫৭৫২৪৫৮৭২, ফেইসবুকে সার্চ করুন @attaqwastore
ডাঙ্গিপারা (আল জামিয়া আস-সালাফিয়্যাহ সংলগ্ন), পবা, রাজশাহী।

লোক দেখানো আমলের পরিণতি

-ড. ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর*

(শেষ পর্ব)

খালেছ হৃদয়ে ইবাদত করার গুরুত্ব : *

একজন মুসলিমকে সকল ইবাদত খালেছ অন্তরে আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তে করতে হবে। আর সেটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ত্বরীকায় সম্পাদন করতে হবে। নতুবা তা মহান প্রভুর নিকটে গৃহীত হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ‘অতএব আত্মীয়স্বজন, অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকে তাদের প্রাপ্য দিয়ে দাও। এ কাজটি সর্বোত্তম ওদের জন্যে, যারা একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি কামনা করে এবং ওরাই সত্যিকার সফলকাম’ *(আর-রূম, ৩০/৩৮)*। আল্লাহ তাআলা ছাহাবীদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় বলেন, ﴿يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾ ‘তারা একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ কামনা করে’ *(আল-ফাতহ, ৪৮/২৯)*। তিনি আরও বলেন, ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾ ‘তবে পরম মুত্তাক্বী ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হবে। যিনি স্বীয় সম্পদ দান করে আরো কল্যাণ প্রাপ্তি তথা তা বৃদ্ধির আশায়। তার প্রতি কারোর অনুগ্রহের প্রতিদান হিসাবে নয়। শুধু তার মহান প্রভুর একান্ত সন্তুষ্টি লাভের আশায়। সে জান্নাত পেয়ে অচিরেই সন্তুষ্ট হবে’ *(আল-লায়ল, ৯২/১৭-২১)*।

আমল করার পূর্বে আক্বীদা পরিশুদ্ধ হওয়া জরুরী। কেননা সঠিক আক্বীদা পোষণ করত আমল করলে তা মহান প্রভুর নিকট গৃহীত হবে। অন্যথা তা বিফলে যাবে। বিশুদ্ধ আক্বীদা পোষণ করে খালেছ অন্তরে আমল করতে হবে। নচেৎ তা আল্লাহ কবুল করবেন না। রাসূল ﷺ বলেন, إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ ‘নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা কোনো আমল কবুল করবেন না, যদি তাঁর জন্য তা খালেছ হৃদয়ে ও তাঁর সন্তুষ্টির জন্য না করা হয়’।[১]

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, إِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوْبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ ‘নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের চেহারা ও সম্পদের দিকে দেখবেন না; বরং তিনি দেখবেন তোমাদের অন্তর ও আমলসমূহের দিকে’।[২] প্রকৃত মুমিন-মুসলিম হতে চাইলে সর্বপ্রথম আক্বীদা পরিশুদ্ধ করতে হবে। সঠিক আক্বীদাবিহীন আমল মূল্যহীন। কেননা হাদীছে আমলে পূর্বে আক্বীদার উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নের হাদীছগুলোর প্রতি গভীরভাবে মনোযোগ দিলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ دُلَّنِيْ عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوْبَةَ وَتُؤَدِّى الزَّكَاةَ الْمَفْرُوْضَةَ وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لاَ أَزِيْدُ عَلَى هَذَا فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا.

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, একদা একজন বেদুঈন রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, আমাকে এমন আমলের কথা বলে দিন, যে আমল করলে আমি জান্নাতে যেতে পারব। তিনি বললেন, তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে— তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, ফরয ছালাত আদায় করবে, ফরয যাকাত আদায় করবে এবং রামাযানের ছিয়াম পালন করবে। তখন ঐ ব্যক্তি আল্লাহর শপথ করে বললেন, আমি এর বেশি করব না। যখন লোকটি চলে গেলেন, তখন রাসূল ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি একজন জান্নাতী ব্যক্তিকে দেখে আনন্দিত হতে চায়, সে যেন এই ব্যক্তির দিকে দেখে।[৩]

হুযায়ফা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, একদা নবী ﷺ-কে আমার বুকে লাগালাম। অতঃপর তিনি বললেন, مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে ‘লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ’ বলে এবং সেটাই তার শেষ কথা হয়, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একটি ছিয়াম পালন করবে এবং সেটাই তার শেষ আমল হবে, তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর

---

* শিক্ষক, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

১. নাসাঈ, হা/৩১৪০; ত্বাবারানী কাবীর, হা/৭৬২৮; কানযুল উম্মাল, হা/৫২৬১; আল-মুসনাদুল জামে‘, হা/৫৩৩৪; সিলসিলা ছহীহা, হা/৫২, সনদ ছহীহ।

২. ছহীহ মুসলিম, হা/৬৭০৮; মুসনাদে আহমাদ, হা/৭৮১৪; ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/৩৯৪; মিশকাত, হা/৫৩১৪।

৩. ছহীহ বুখারী, হা/১৩৯৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬; মিশকাত, হা/১৪।

সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কিছু ছাদাক্বা করে এবং সেটা তার শেষ কর্ম হয়, তবে সেও জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[৪]

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, مَنْ الْتَمَسَ رِضَا اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ وَمَنْ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ وَكَلَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ 'যে ব্যক্তি মানুষকে অসন্তুষ্ট করে একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি কামনা করে, মানুষের ব্যাপারে তার জন্য একমাত্র আল্লাহই যথেষ্ট। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে অসন্তুষ্ট করে মানুষের সন্তুষ্টি কামনা করে, আল্লাহ তাআলা তাকে মানুষের হাতে ছেড়ে দেন'।[৫]

আল্লামা ইবনু কাছীর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'কোনো আমল আল্লাহ কবুল করবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ আমলের মধ্যে এ দুটি শর্ত একত্রিত না হবে: (ক) কাজটি সঠিক পদ্ধতিতে শরীআত মোতাবেক অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশিত পন্থায় হওয়া এবং (খ) শিরক থেকে মুক্ত হওয়া'।[৬]

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য খালেছ অন্তরে ইবাদত করার গুরুত্ব অত্যধিক। এরূপ ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা জান্নাতে প্রবেশ লাভের সুযোগ দিয়ে ধন্য করবেন। এককথায় শিরকমুক্ত আক্বীদা ও বিদআতমুক্ত আমলের প্রতিদান হচ্ছে জান্নাত।

খালেছ অন্তরে ঈমান আনার ফযীলত :

খালেছ অন্তরে ঈমান আনলে জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ পাওয়া যাবে। কোনো অপরাধ থাকলেও এক সময় খাঁটি ঈমানের বদৌলতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অপরাধ অনুযায়ী হয়তো সে আযাবে পতিত হতে পারে। তবে তাকে শিরক হতে মুক্ত থাকতে হবে। আর খাঁটি ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করতে হবে। বিশুদ্ধ ঈমানের প্রতিদান সম্পর্কে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, মুআয ইবনু জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ صَادِقاً مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ 'যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করবে এমতাবস্থায় সততার সাথে হৃদয় থেকে (ইখলাছের সাথে) সাক্ষ্য দিবে আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই এবং নিশ্চয় মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর রাসূল— সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[৭] অপর বর্ণনায় রয়েছে- উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ 'যে ব্যক্তি জেনে বুঝে এই বিশ্বাস নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে যে, 'আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোনো উপাস্য নেই, সে ব্যক্তি অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[৮]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) أَنَّهُ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ.

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে আপনার শাফাআত পেয়ে কে সবচেয়ে বেশি ধন্য হবে? উত্তরে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, কিয়ামতের দিন মানুষের মাঝে ঐ ব্যক্তি আমার শাফাআত পেয়ে বেশি ধন্য হবে, যে একনিষ্ঠচিত্তে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বলেছে।[৯]

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّيْ رَسُولُ اللهِ لاَ يَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فِيهِمَا إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। যে এ বিষয় দুটির প্রতি নিঃসন্দেহে বিশ্বাস রেখে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[১০] অপর বর্ণনায় রয়েছে, فَلاَ يُحْجَبُ عَنِ الْجَنَّةِ 'সে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে না'।[১১] অন্যে আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ 'যে ব্যক্তি সত্য দৃঢ় মনে বিশুদ্ধ আক্বীদার সাথে এ সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই। তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও'।[১২]

৪. মুসনাদে আহমাদ, হা/২৩৩৭২; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হা/৩৯১৯; কানযুল উম্মাল, হা/৪৩৩৭৬; আল-মুসনাদুল জামে', হা/৩২৬২, সনদ ছহীহ।

৫. তিরমিযী, হা/২৪১৪; ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/২৭৭; সিলসিলা ছহীহা, হা/২৩১১; মিশকাত, হা/৫১৩০, সনদ ছহীহ।

৬. আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম (দারু তাইয়েবা, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.), ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪০৩।

৭. মুসনাদে আহমাদ, হা/২২০৫৬; শুআবুল ঈমান, হা/৭; মুসনাদে আবী ইয়া'লা, হা/৩২২৮; সিলসিলা ছহীহা, হা/২২৭৮, সনদ ছহীহ।

৮. ছহীহ মুসলিম, হা/১৪৫; মুসনাদে আহমাদ, হা/৪৯৮; ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/২০১; ত্বাবারানী আওসাত্ব, হা/১৬৬৩; মিশকাত, হা/৩৭।

৯. ছহীহ বুখারী, হা/৯৯; মুসনাদে আহমাদ, হা/৮৮৪৫; মুসতাদরাকে হাকেম, হা/২৩৩; মুসনাদে বাযযার, হা/৮৪৬৯; ছহীহ আত-তারগীব, হা/১৫২০।

১০. ছহীহ মুসলিম, হা/২৭, ১৪৭; মুসনাদে আবূ আওয়ানা, হা/১৬; আল-মুসনাদুল জামে', হা/১৪৭৪৮; ছহীহুল জামে', হা/১০০৯।

১১. ছহীহ মুসলিম, হা/১৪৮; মিশকাত, হা/৫৯১২।

১২. ছহীহ মুসলিম, হা/৩১, ১৫৬; ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/৪৫৪৩; মুসনাদে আবূ আওয়ানা, হা/১৭; আল-মুসনাদুল জামে', হা/১২৬৩০; মিশকাত, হা/৩৯।

বিশুদ্ধ ঈমানের প্রতিদান হচ্ছে জান্নাত। যে ব্যক্তি অন্তর থেকে لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ বলবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। কারো জীবনের সর্বশেষ স্বীকৃতি যদি উক্ত বাক্যটি হয়, তাহলেও সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। নবী-রাসূলগণের মৌলিক দাওয়াতই এটি।

রিয়া থেকে বাঁচার উপায় :

রিয়া এবং সুমআ তথা লোক দেখানো আমল থেকে পরিত্রাণের জন্য কতিপয় উপায় তুলে ধরা হলো। যেমন—

(১) ইবাদতের সময় আল্লাহকে গভীরভাবে স্মরণ করা। কায়মনোবাক্যে গভীরভাবে ইবাদাতে মনোনিবেশ করা। এটা চিন্তা করা যে, আল্লাহ আমার মনের খবর জানেন। আমি কেন করছি, কী করছি সবই তিনি দেখছেন। যেমন হাদীছে এসেছে, أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ 'তুমি আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করো যেন তুমি তাঁকে দেখছ। যদি তা সম্ভব না হয়, তবে তিনি তোমাকে দেখছেন'।[১৩]

(২) রিয়ার ভয়াবহতার কথা স্মরণ করা। প্রদর্শন আল্লাহর ক্রোধের কারণ, তা সবসময় মনে রাখা। কেননা রিয়া শিরক, যার পরিণতি জাহান্নাম।[১৪]

(৩) রিয়ামুক্ত আমলের পুরস্কারের কথা স্মরণ করা এবং তা অর্জনের প্রত্যয় গ্রহণ করা। কেননা আল্লাহর জন্য নিবেদিত আমলের প্রতিদান জান্নাত।[১৫]

(৪) সকল প্রকার অহংকার বর্জন করা। কেননা অহংকার হতেই রিয়া জন্মলাভ করে থাকে। আর অহংকারীর শেষ ঠিকানা জাহান্নাম।[১৬]

(৫) আল্লাহর নিকট অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাওয়া। যেন তিনি অনুগ্রহ করে আমলটি কবুল করে নেন। তাঁর নিকট ক্ষমা চাইলে তিনি ক্ষমা করেন।[১৭]

(৬) রিয়ামুক্ত আমলের তাওফীক্ব চেয়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা।[১৮]

'আমি অনেকের মুখে নীতির কথা শুনেছি, কিন্তু তার মধ্যে নীতির লেশমাত্র দেখিনি। অনেককে অহংকারের সমালোচনা করতে শুনেছি, কিন্তু অহংকারের ডিপো হিসাবে তাকেই পেয়েছি। অনেককে আমিত্বের বদনাম করতে শুনেছি, কিন্তু তাকেই দেখেছি তিনিই আমিত্বের ফাউন্ডেশন। অনেকের মুখে তাক্বওয়ার বয়ান শুনেছি, কিন্তু তাকেই পেয়েছি তাক্বওয়াশূন্য। অনেকের মুখে সদাচরণের উপদেশ শুনেছি, কিন্তু তার মধ্যেই বদমেযাজের গন্ধ পেয়েছি। অনেকের মুখে কোমল স্বভাবের গল্প শুনেছি, কিন্তু তার মুখেই শুনেছি কর্কশের ঝনঝনানি'। - তাঈস

দান করে অনুগ্রহ (খোঁটাদানকরীর) প্রকাশকারীর পরিণতি :

দান করা ও কারো উপকার করার পর খোঁটা দেওয়া বা অনুগ্রহ প্রকাশ করা নিন্দনীয় স্বভাব। বিপদে কোনো ব্যক্তিকে সাহায্য করে অন্য সময়ে তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে খোঁটা দেওয়া ইসলামে নিষিদ্ধ। বিপদে সাহায্য করা অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ আমল। কিন্তু এরূপ করে তাকে অন্য সময় লজ্জা দেওয়া যাবে না। অন্যথা তার দানে রিয়া (লোক দেখানো আমল) হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ফলে তার সবকিছুই বিফলে যাবে। সেজন্য কাউকে খোঁটা দেওয়া বা দান করার পর অনুগ্রহ প্রকাশ করা যাবে না। এমর্মে এরশাদ হচ্ছে,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لاَ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান-খয়রাত বরবাদ করো না সেই ব্যক্তির মতো যে নিজের ধনসম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে দান করে এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। এ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত এমন এক মসৃণ পাথরের মতো, যার উপর কিছু মাটি পড়েছিল। তারপর ঐ পাথরের উপর প্রবল বৃষ্টি হলো এবং তাকে পূর্ণ পরিষ্কার করে দিল। তারা ঐ বস্তুর কোনো নেকী পায় না, যা তারা উপার্জন করেছে। আল্লাহ কাফের সম্প্রদায়কে সঠিক পথ দেখান না' *(আল-বাক্বারা, ২/২৬৪)*।

---

১৩. ছহীহ বুখারী, হা/৫০; ছহীহ মুসলিম, হা/১০২; আবূ দাঊদ, হা/৪৬৯৫; নাসাঈ, হা/৪৯৯০; আহমাদ, হা/৩৬৭; মিশকাত, হা/২।

১৪. ছহীহ বুখারী, হা/৫০৩২; ছহীহ মুসলিম, হা/১৯০৫; নাসাঈ, হা/৩১৩৭; আহমাদ, হা/৮২৬০; শুআবুল ঈমান, হা/৬৮০৫; মিশকাত, হা/২০৫।

১৫. ছহীহ বুখারী, হা/১৩৯৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬; মুসনাদে আহমাদ, হা/৮৪৯৬; ছহীহ ইবনু খুযায়মা, হা/২২৫৭; মিশকাত, হা/১৪।

১৬. ছহীহ মুসলিম, হা/২৭৬; আবূ দাঊদ, হা/৪০৯১; তিরমিযী, হা/১৯৯৮; ইবনু মাজাহ, হা/৪১৭৩; আহমাদ, হা/৪৩১০; মিশকাত, হা/৫১০৭।

১৭. ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৮৭, ৭০০৯; ইবনু মাজাহ, হা/৩৮২১; বায়হাক্বী শুআবুল ঈমান, হা/৭০৪৭; মিশকাত, হা/২২৬৫।

১৮. আদাবুল মুফরাদ, হা/৭১৬; ছহীহুল জামে', হা/৩৭৩১, সনদ ছহীহ।

খোঁটাদানকারীর কোনো আমল কবুল হয় না :

উপকার করে খোঁটাদানকারীর ফরয ও নফল কোনো আমল গ্রহণ করা হয় না। আবূ উমামা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ثلاثةٌ لا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُمْ يَوْمَ القِيامَةِ صَرْفاً ولا عَدْلاً عاقٌّ وَمَنَّانٌ ومُكَذِّبٌ بالقَدَرِ ‘কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির ফরয ও নফল কোনো আমল কবুল হবে না। তারা হলো— পিতা-মাতার অবাধ্য, উপকার করে খোঁটাদানকারী ও তাক্বদীরের প্রতি অবিশ্বাসকারী’।[১৯]

বিপদে কাউকে সহযোগিতা করে সেই অনুগ্রহের প্রকাশ করলে তা কঠিন পাপে পরিণত হয়। পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, খোঁটাদানকারী ও ভাগ্যে অবিশ্বাসকারীর ফরয ও নফল কোনো ইবাদত কবুল হয় না। কিয়ামতে তার আমল কোনো কাজে আসবে না। রিয়া বা লোক দেখানোর পাপে জড়িয়ে যাওয়ার কারণে তা শিরকে রূপান্তরিত হয়। তার খোঁটা দিয়ে কাউকে লজ্জিত করা উচিত নয়।

খোঁটাদানকারীর সাথে আল্লাহ কথা বলবেন না :

খোঁটা দেওয়া অত্যন্ত জঘন্য স্বভাব। এরূপ ব্যক্তির পরিণতি খুব ভয়াবহ। আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ الْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ

‘তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না। তাদের দিকে তাকাবেন না। আর তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। তারা হলো— দানকৃত বস্তুর খোঁটাদানকারী, পায়ের গিরার নিচে কাপড় পরিধানকারী এবং মিথ্যা কসম করে মাল বিক্রয়কারী’।[২০]

দান করার পর অনুগ্রহ প্রকাশকারীর সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা কথা বলবেন না। রহমতের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাবেন না। তাকে পবিত্র করবেন না। পরকালে তার জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা। তাই এমন নোংরা কর্ম পরিহার করা জরুরী।

খোঁটাদানকারী জান্নাতে যাবে না :

খোঁটাদানকারী ব্যক্তির পরিণাম অত্যন্ত ভয়ংকর। শেষ দিবসে তাকে ভয়াবহ শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। এরূপ ব্যক্তি জান্নাতে যাওয়ার সুযোগ পাবে না। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ وَلاَ عَاقٌّ وَلاَ مُدْمِنُ خَمْرٍ ‘পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, জুয়া ও লটারীতে অংশগ্রহণকারী, খোঁটাদানকারী এবং সর্বদা মদপানকারী জান্নাতে যাবে না’।[২১] অপর বর্ণনায় রয়েছে— সালেম ইবনু আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ وَالدَّيُّوثُ وَثَلاَثَةٌ لاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى ‘কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তিন শ্রেণির ব্যক্তির দিকে দৃষ্টি দিবেন না। তারা হলো— পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, পুরুষের বেশ ধারণকারী নারী ও দায়্যূছ (নিজ স্ত্রীর পাপাচারে যে ঘৃণাবোধ করে না)। আর তিন শ্রেণির ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তারা হলো— পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, নেশাদার দ্রব্য সেবনকারী ও উপকার করে খোঁটাদানকারী (দান করার পর অনুগ্রহ প্রকাশকারী)’।[২২]

দান করে খোঁটা দেওয়ার নোংরা স্বভাবের লোক সমাজে অনেক দেখা যায়। যারা কথায় কথায় তার সহযোগিতার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চায়। সে বড় দাতা হিসাবে নিজেকে প্রকাশ করতে চায়। অনেক সময় গ্রহীতার নিকট থেকে বিভিন্ন সুবিধা ভোগের ফন্দি আঁটতে থাকে। এরূপ গর্হিত কাজ ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। এর মাধ্যমে গ্রহীতাকে হেয় করা হয়। সামাজিকভাবে তাকে লজ্জার মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়। মানসিকভাবে তাকে কষ্ট দেওয়া হয়। অথচ কোনো মানুষকে কষ্ট দেওয়া বা তার সম্মানের হানি করা শরীআতে নিষিদ্ধ। প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মমর্যাদা রয়েছে। তাকে সম্মান নিয়ে জীবনযাপনের সুযোগ দেওয়া প্রতিটি মুসলিমের নৈতিক দায়িত্ব। এ সম্মানটুকু হরণ করা নেহায়েত অন্যায়। খোঁটাদানকারী ব্যক্তি তার আত্মমর্যাদার হানি করে থাকে, যা খুবই খারাপ কাজের মধ্যে গণ্য। তাই এরূপ জঘন্য কাজ বর্জন করে আল্লাহর নিকট তওবা করা উচিত।

---

১৯. ত্বাবারানী কাবীর, হা/৭৫৪৭; কানযুল উম্মাল, হা/৪৩৮১২; ছহীহ আত-তারগীব, হা/২৫১৩; সিলসিলা ছহীহা, হা/১৭৫৮, সনদ হাসান।

২০. ছহীহ মুসলিম, হা/১০৬ ও ৩০৭; নাসাঈ, হা/৫৩৩৩; ইবনু মাজাহ, হা/২২০৮; বায়হাক্বী কুবরা, হ/৭৬৩০, সনদ ছহীহ।

২১. নাসাঈ, হা/৫৬৭২; মুসনাদে আহমাদ, হা/১১২৩৮; দারেমী, হা/২০৯৪; সিলাসলা ছহীহা, হা/৬৭৩; মিশকাত, হা/৪৯৩৩, সনদ হাসান।

২২. নাসাঈ, হা/২৫৬২; মুসনাদে আহমাদ, হা/৬১৮০; ত্বাবারানী আওসাত্ব, হা/২৪৪৩; সিলসিলা ছহীহা, হা/৬৭৪, সনদ হাসান।

মহানবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম : উম্মাহর পাওয়া শ্রেষ্ঠ উপহার

-ড. মো. কামরুজ্জামান*

পৃথিবীতে একটাই নাম, একটাই জীবনী, একটাই আদর্শ। যার কীর্তিগাথা ইতিহাস বিশ্বময় আলোচিত। যার চরিত্র-মাধুর্য সারা দুনিয়ায় আলোড়িত। যার কোমলতা ও বলিষ্ঠতা তামাম দুনিয়ায় নন্দিত। যার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত— গোটা জীবনী স্মরণ করে একজন পাঠক হয়ে পড়ে আপ্লুত। তাঁর জন্ম হয়েছিল সঊদী আরবের মরুময় পবিত্র নগরী মক্কায়। প্রসিদ্ধ কুরাইশ পরিবারে হয়েছিল তাঁর আগমন। তাঁর উপাধি ছিল আল-আমীন। তাঁর সততা ও বলিষ্ঠতায় মক্কাবাসী তাকে এ উপাধিতে ভূষিত করেছিল। অল্প বয়সেই যার বিচরণ ঘটেছিল সিরিয়ায়। তাঁর সিরিয়া বিচরণের উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্য। তাঁর আগমনটা ছিল বর্বরতায় ভরা। এ সময়টিকে ঐতিহাসিকগণ মধ্যযুগ বলে অভিহিত করেছেন। মধ্যযুগীয় বর্বরতা বিশ্বে সমধিক আলোচিত ও সমালোচিত। এ সময় গোটা বিশ্বের মতো আরব সমাজ ছিল অশান্তি ও অস্থিরতায় ভরা। সামাজিক এ অস্থিরতা তাঁকে ব্যাকুল করে তুলেছিল। এ অস্থিরতা দূরীকরণে তিনি নিজেকে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সারা দুনিয়ার অশান্তি দূর করতে তিনি চিন্তা-গবেষণা শুরু করলেন। আর এজন্য তিনি হেরাগুহাকে বেছে নিলেন। বিরামহীন ১৫ বছর যাবৎ তিনি এ গুহাতে ধ্যানে মগ্ন থাকলেন! অবশেষে গুহাতে তাঁর চিন্তার রাজ্য উন্মোচিত হলো। আল্লাহর পক্ষ থেকে পরিচ্ছন্ন এক সমাজদর্শনের গাইডলাইন নাযিল হলো। হেরার রশ্মি তাঁর চিন্তাজগতকে আলোকিত করল। হেরার এ রশ্মি নিয়ে তিনি বেরিয়ে এলেন জনসম্মুখে। এ রশ্মির প্রকৃতি হলো আল্লাহর কথা তথা আল-কুরআন। এ কুরআন দিয়ে শুরু হলো তাঁর জীবনের নতুন অধ্যায়। এ রশ্মি বিচ্ছুরণে সর্বপ্রথম তিনি গোপন নীতি অবলম্বন করলেন। এ সময় তিনি নিকটাত্মীয়দেরকে আল-কুরআনের রশ্মি দ্বারা আলোকিত করলেন। এরপর তাঁর জীবনে শুরু হলো কঠিন অধ্যায়। এ অধ্যায়ে তিনি শুরু করলেন আল-কুরআনের প্রকাশ্য দাওয়াত। কিন্তু অধ্যায়টি মোটেই সুখকর ছিল না। এ অধ্যায়টি ছিল সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে পরিপূর্ণ। এ পর্যায়ে শুরু হলো প্রতিপক্ষের নির্মম অত্যাচার ও নির্যাতন। তাঁর এ অধ্যায়টি ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়াবহ নিষ্ঠুরতায় পরিপূর্ণ। তায়েফের ময়দানে প্রতিপক্ষের আঘাত ছিল নির্মমতায় ভরা। চলমান নির্যাতনের মধ্যেই তিনি গমন করলেন বায়তুল মুক্বাদ্দাসে। সেখান থেকে ঊর্ধ্বাকাশে ভ্রমণ। আবার মক্কায় পুনঃগমন। এরপর মদীনার পানে হিজরত। মদীনার সনদ, আকাবার শপথ, হুদায়বিয়ার সন্ধি। মক্কা বিজয়, বিদায় হজ্জ এবং মৃত্যু। এসব কিছু শুধু একজন মানুষকে ঘিরেই। একজনকে কেন্দ্র করে হাজারো মানুষের লেখা। একজন মানুষের ঘটনা বহু মানুষের মুখে। বহু শতাব্দী ধরে তাঁরই সুর আর তাঁরই মূর্ছনা। তারপরও যেন অসীম তাঁর জীবনী। বাতাসে তাঁর জীবনী অফুরান। ছন্দের জগতে তিনি অম্লান। এত লেখনি, এত বক্তব্য! তারপরও যেন বাকি রয়েছে ঢের। যেন সবই রয়েছে বাকি। রয়েছে না বলা অনেক কিছু। তিনি আর কেউ নন। তিনি হলেন মরুর দুলাল, আব্দুল্লাহ ও আমেনার ছেলে। আব্দুল মুত্তালিবের বংশ উজ্জ্বলকারী প্রিয় নাতি ও বিশ্বনবী। নাম তাঁর মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম। তাঁর জন্ম থেকে মৃত্যু—ধারাবাহিক ঘটনার বিবরণই সীরাত। তাঁর শারীরিক কাঠামোর বর্ণনা, দৈহিক গঠনের বর্ণনা, তাঁর কার্যক্রম ইত্যাদি হলো শামায়েল। তাঁর জীবনের সকল কাজই জগতবাসীর জন্য অনুসরণীয়-অনুকরণীয়।

মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম দুই জাহানের নেতা। অথচ সাদাসিধে জীবনযাপনে তিনি ছিলেন অতি সাধারণের মতো। তাঁর ব্যক্তি জীবনে ছিল না কোনো জৌলুস। গৃহস্থালির কাজ নিজ হাতে সম্পন্ন করতে তিনি কোনোরূপ লজ্জাবোধ করতেন না। নিজের কাজ নিজেই সম্পন্ন করতেন। নিজ হাতে উটকে ঘাস খাওয়াতেন। নিজের জুতা নিজে সেলাই করতেন। ভৃত্যদের সাথে একসঙ্গে খাবার খেতেন। নিজেই ছাগির দুধ দোহন করতেন। যাঁতায় নিজেই আটা মাড়াই করতেন। বাজারে গিয়ে নিজেই সদাই করতেন। এতে তিনি বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ করতেন না। ধনী ও গরীব উভয়ের সাথে মুছাফাহা ও আলিঙ্গন করতেন। সর্বদা আগে সালাম দিতেন। যেকোনো ব্যক্তি দাওয়াত দিলে তা গ্রহণ করতেন। কাউকে তিনি তুচ্ছজ্ঞান করতেন না। তিনি দয়ার্দ্রচিত্তের অধিকারী ছিলেন। তিনি পরিছন্নতা পছন্দ করতেন। নিজেও পরিচ্ছন্ন থাকতেন। সবার সাথে হাসিমুখে কথা বলতেন। সবসময় মুচকি হাসি লেগে থাকত তাঁর মুখে। কখনো অট্টহাসি দিতেন না। নিষ্পাপ হয়েও পরকালের ভয়ে তিনি থাকতেন চিন্তিত। তাঁর কথায় বা আচরণে কোনোরূপ বিরক্তি প্রকাশ পেত না। তিনি রুক্ষতা ও বদমেজাজ পরিহার করতেন। তিনি ছিলেন নম্র স্বভাবের, তবে তার মধ্যে ভীরুতা ও কাপুরুষতা ছিল না।

* অধ্যাপক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

তিনি ছিলেন দানশীল, তবে অপচয় করতেন না। তিনি পেটভরে খেতেন না। তিনি ছিলেন নির্লোভ, অল্পে তুষ্ট ও ধৈর্যশীল এক মহামানব। মহানবী ﷺ-এর বিছানা ছিল অতি সংক্ষিপ্ত ও সাদাসিধে। লতা-পাতা ছিল তার বিছানার উপাদান। ঘুম থেকে উঠলে তাই তাঁর গায়ে দাগ দেখা যেত। বিছানা তাঁর এতই ছোট ছিল যে, তিনি যখন রাতে ছালাত পড়তেন, আয়শা রাযিয়াল্লা-হু আনহা তখন এক পাশে জড়ো হয়ে থাকতেন।[১] মহানবী ﷺ ছিলেন কোমল হৃদয়ের অধিকারী। তিনি জীবনে কখনো স্ত্রীদের প্রহার করেননি। এমনকি ভৃত্যদেরকেও নয়। অথচ শত্রুদের বিরুদ্ধে তিনি বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেছেন। কেউ তাকে কষ্ট দিলে তিনি তার প্রতিশোধ নেননি। শুধু আল্লাহর মর্যাদা ও সম্মানের ক্ষেত্রে প্রতিশোধ নিয়েছেন।[২] মূলত আল্লাহ তাকে বিশ্ববাসীর জন্য সর্বোত্তম আদর্শরূপে প্রেরণ করেছেন *(আল-আহযাব, ৩৩/২১)*। নিশ্চয়ই আমি সকল মানুষের জন্যই রাসূল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছি *(আল-আ'রাফ, ৭/১৫৮)*। তাই তিনি শুধু নির্দিষ্ট কোনো এলাকার নবী নন। তিনি কোনো নির্দিষ্ট দেশের জন্য প্রেরিত হননি। তিনি ছিলেন বিশ্বনবী; বিশ্বমানবতার কল্যাণকামী এক মহামানব। তিনি সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন *(আল-আম্বিয়া, ২১/১০৭)*। সকল জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও গোত্রের জন্য তিনি এক অনুকরণীয় কালজয়ী আদর্শ। আর তিনি সকল প্রকার উত্তম চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত *(আল-ক্বালাম, ৬৮/৪)*। আর এ কারণেই তাঁকে ভালোবাসলে আল্লাহকে ভালোবাসা হবে; আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া যাবে *(আলে ইমরান, ৩/৩১)*। আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী ﷺ শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। সাগরসম মমতায় ভরা হৃদয় দিয়ে তিনি আরববাসীকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। কলুষিত মনকে পরিচ্ছন্ন করেছিলেন। তাদেরকে তিনি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দিয়েছিলেন *(আল-জুমআ, ৬২/২)*। তাঁর প্রণীত শিক্ষাব্যবস্থা ছিল অতুলনীয়। তিনি ছিলেন মানবজাতির মহান শিক্ষক; ছিলেন আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত মহান পাঠক। আল্লাহ বলেন, 'আপনি আপনার প্রভুর নামে পড়ুন! যিনি সৃষ্টি করেছেন' *(আল-আলাক্ব, ৯৬/১-২)*। মহানবী ﷺ তাঁর ২৩ বছরের জীবনে মদীনায় শিক্ষাবিপ্লব ঘটিয়েছিলেন। তার এ শিক্ষাবিপ্লব ছিল মসজিদকে কেন্দ্র করে। তিনি মক্কায় দারুল আরকাম নামে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেছিলেন। এখানে ছাহাবীগণ নিয়মিত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কাজে সময় ব্যয় করতেন। মদীনায় হিজরত করে সর্বপ্রথম তিনি কূবা নামক স্থানে মসজিদ নির্মাণ করেন। এরপর নির্মাণ করেন মসজিদে নববী। মহানবী ﷺ আছর থেকে এ মসজিদে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা করতেন। এ সকল প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের জন্য পাঠদানের ব্যবস্থা ছিল। মদীনা ও পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে মানুষ দলে দলে এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে শিখতে আসত।

শিশু, বালক-বালিকা, যুবক-যুবতিরা নিয়মিতভাবে এখানে লেখাপড়া করত। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, কৃষক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী নির্বিশেষে সবাই এখানে পড়ার জন্য জমায়েত হতো। মহিলাদের জন্য দিন এবং সময় নির্ধারিত ছিল। মদীনার মসজিদে আলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু এবং তার চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু লেকচার প্রদান করতেন। নবীজির শিক্ষাব্যবস্থা ছিল অবাধ, মুক্ত ও স্বাধীন। তাঁর শিক্ষা ছিল জীবনমুখী ও সার্বজনীন। এ ব্যবস্থায় কোনো সম্মানি ছিল না। শিক্ষাব্যবস্থা চলত মদীনা রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায়। তাঁর প্রণীত শিক্ষা দিয়েই তিনি আরববাসীকে আলোকিত করেছিলেন। এ শিক্ষার মাধ্যমে অন্ধকার যুগ আলোকিত যুগে পরিবর্তন হয়েছিল। মাত্র ২৩ বছরের ব্যবধানে একটি বর্বর, অসভ্য, নিষ্ঠুর ও শৃঙ্খলমুক্ত জাতিকে বশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। একটি কালেমার আওয়াজে সকলকে এক পতাকার ছায়াতলে একত্রিত করেছিলেন। ইতিহাসের গতিধারাকে তিনি পালটে দিয়েছিলেন। তিনি অসভ্য-বর্বর একটি পরিবেশকে জ্ঞানের আলো দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিয়েছিলেন। তিনি অশান্ত একটি জনপদকে নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে দিয়েছিলেন। ফলে আরব সমাজের রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সংস্কৃতিতে নৈতিকতার বিপ্লব ঘটেছিল। এ ব্যক্তিটির ﷺ বাল্যকাল ও কৈশোরকাল ছিল সততা আর বিশ্বস্ততায় ভরা। ফলে তিনি আল-আমীন তথা বিশ্বস্ত উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। যৌবনকালে ছিলেন তিনি প্রাজ্ঞ ও বিচক্ষণ সংগঠক। পূর্ব থেকে চলে আসা সমাজে বিরাজমান কলহ মিটাতে তিনি গঠন করেছিলেন সামাজিক শান্তিসংঘ। এ শান্তিসংঘের নাম ছিল হিলফুল ফুযূল। তিনি এ যুবক বয়সেই ধ্বংসোন্মুখ আরবজাতিকে বাঁচাতে উদগ্রীব হয়ে পড়েছিলেন। যুবক মুহাম্মাদের ﷺ এ চেতনা গোটা বিশ্বের যুবকদের জন্য হয়ে আছে এক অনুপম আদর্শ।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

১. ছহীহ বুখারী, হা/৪৯১৩, ৩৮২।

২. ছহীহ মুসলিম, হা/২৩২৮।

হক্বের মানদণ্ড

মূল (উর্দূ) : সাইয়্যেদ মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী রাহিমাহুল্লাহ
*অনুবাদ : আখতারুজ্জামান বিন মতিউর রহমান**

ইমাম আ'যম রাহিমাহুল্লাহ-এর মর্যাদার বর্ণনা :

সম্মানিত ব্যক্তিদের ন্যায় ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ আমাদের নিকট মর্যাদা এবং গর্বের পাত্র। কেননা তিনি সঠিক বিষয়াবলির ক্ষেত্রে আমাদের অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। তবে তার যে সকল মর্যাদার বর্ণনা বাস্তবতার দৃষ্টিতে ছহীহ সনদ দ্বারা প্রমাণিত নয়, সে সকল মিথ্যা প্রশংসা বর্জনীয় বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। কেননা আগের মানুষরা এই কারণেই ধ্বংস হয়েছে এবং তারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। এই জন্য আমাদের উপর জরুরী হয়েছে যে, ওই সকল লোকের প্রকৃত ও প্রামাণ্য চিত্র মানুষের সামনে তুলে ধরা, যারা দুর্বল প্রকৃতির বক্তব্য পেশ করে, বিশ্লেষক ও নির্ভরযোগ্য আলেমদের নামে তা প্রচার করে, তাদের বক্তব্যে ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ-এর ব্যাপারে তাবেঈ হওয়ার দাবি করে এবং তারা তা প্রমাণ করার জন্য জাল, সূত্রবিচ্ছিন্ন হাদীছ ও বানোয়াট ঘটনা বর্ণনা করে থাকে। আর এই সত্য উদ্ঘাটনে ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ-এর মর্যাদাহানি এবং নিন্দার কোনো বিষয় নেই। কেননা তার মান-মর্যাদা তাবেঈ হওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়; বরং তিনি মর্যাদাবান হওয়ার জন্য তার মুজতাহিদ হওয়া, সুন্নাহর অনুসারী হওয়া এবং মুত্তাক্বী-পরহেযগার হওয়াই যথেষ্ট। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ﴾ 'নিশ্চয় আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে অধিক মর্যাদাবান হলো সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাক্বওয়াশীল' *(আল-হুজুরাত, ৪৯/৩)*।

ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ-এর তাবেঈ হওয়ার বিষয়টির পর্যালোচনা :

ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ-এর প্রশংসাযোগ্য উজ্জ্বল মর্যাদার কথা বর্ণিত হয়েছে। তবে অধিকাংশ ইমাম তার তাবেঈ হওয়ার প্রবক্তা নন। নিম্নে তার বর্ণনা পেশ করা হলো :

তানভীরুল হক্ব-এর লেখক মৌলভী মুহাম্মাদ শাহ পাক পাটনী বলেন, 'আ'লামুল আখবার' নামক গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে,

এক. ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে নিম্নোক্ত তিনটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন[১]:

(١) طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

(٢) إِنَّ اللهَ يُحِبُّ إِغَاثَةَ اللَّهْفَانِ.

(٣) لو وثق العبد بالله تعالى ثقة الطير لرزقه كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا كما في الطحاوي.

দুই. দ্বিতীয় ছাহাবী যার থেকে তিনি হাদীছ বর্ণনা করেছেন তিনি হলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু আবী আওফা ইবনু আলক্বামা। তিনি ৮৬ অথবা ৮৭ হিজরীতে সকল ছাহাবীর পরে মৃত্যুবরণ করেছেন। তখন ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ ছয় অথবা সাত বছর বয়সী বালক ছিলেন। তিনি তার থেকে এই হাদীছটি বর্ণনা করেন, مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ كذا في الطحاوي 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করে- যদিও তা পাখির বাসার ন্যায় হয়, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করবেন'।[২]

আর 'মুখতাছার' নামক গ্রন্থে ইবনু হাজার রাহিমাহুল্লাহ লিখেছেন, পাঁচ বছর বয়সী বাচ্চার বর্ণনাকৃত হাদীছ গ্রহণযোগ্য। যেমনটি মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারী রাহিমাহুল্লাহ মাহমূদ ইবনু রবী' হতে পাঁচ বছর বয়সে বর্ণিত হাদীছ গ্রহণযোগ্য।

তিন. সাহল ইবনু সাঈদী রাযিয়াল্লাহু আনহু যিনি মদীনায় সকল ছাহাবীর মৃত্যুর পর সর্বশেষ মৃত্যুবরণ করেছেন। তখন ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ আট অথবা এগারো বছরের বালক ছিলেন। তবে তিনি তার থেকে কোনো কিছু বর্ণনা করেননি।

চার. আবূ তুফায়েল ইবনু আমের ইবনু ওয়াছেলা রাযিয়াল্লাহু আনহু মক্কায় ১০২ হিজরীতে সকল ছাহাবীর মৃত্যুর পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আর ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ প্রথম ১৬ বছর বয়সে ৯৬ হিজরীতে হজ্জ করেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নিঃসন্দেহে ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ উক্ত ছাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। কেননা যেখানেই একজন ছাহাবী উপস্থিত থাকতেন, মানুষরা তালাশ করে ছাহাবীদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন।

জবাব : এই চার জন ছাহাবী ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ-এর যুগে জীবিত ছিলেন। তবে তাদের সাথে ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ-এর সাক্ষাৎ কিংবা তাদের থেকে তিনি কোনো হাদীছ বর্ণনা করেছেন, এই দাবী বর্ণনাকারীদের অধিকাংশের মতে ভিত্তিহীন। যেমন- 'মাজমাঊল বিহার' গ্রন্থের লেখক শায়খ

* শিক্ষক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

১. ত্বহত্বী, 'ভূমিকা' ১/৪৭।

২. প্রাগুক্ত।

ইবনু তাহের যার তাহক্বীক্ব সম্পর্কে মুহাদ্দিছগণ এবং ইতিহাসবিদগণ ভালো করে জানেন। তিনি 'তাযকিরা মাওযূআত' নামক গ্রন্থে লিখেছেন,

وكان في أيام أبي حنيفة أربعة من الصحابة أنس بن مالك بالبصرة وعبد الله ابن أبي أوفى بالكوفة وسهل بن سعد الساعدي بالمدينة وأبو طفيل عامر بن واثلة بمكة ولم يلق أحدا منهم ولا أخذ عنه وأصحابه يقولون أنه لقي جماعة من الصحابة وروى عنهم ولا يثبت ذلك عند أهل أهل النقل انتهى كلامه.

'ইমাম আবূ হানীফার যুগে চার জন ছাহাবী বিদ্যমান ছিলেন। তারা হলেন, আনাস ইবনু মালেক বাছরা নগরীতে, আব্দুল্লাহ ইবনু আবী আওফা কূফা নগরীতে, সাহল ইবনু সা'দ আস-সাঈদী মদীনা নগরীতে, আবূ তুফায়েল ইবনু আমর ইবনু ওয়াছেলা মক্কা নগরীতে। ইমাম আবূ হানীফা তাদের কারো সাথে সাক্ষাৎ করেননি। তবে তার সাথীগণ বলে থাকে যে, 'তিনি একদল ছাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং তাদের থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন'। তবে বর্ণনাকারীদের মতে, এই চার জন ছাহাবীর কারো সাথে ইমাম আবূ হানীফার সাক্ষাৎ হয়নি।[৩]

মোল্লা আলী ক্বারী রহিমাহুল্লাহ 'মাক্বাছিদুল হাসানা' গ্রন্থের লেখক আল্লামা সাখাবী হতে 'শারহু শারহে নুখবাতিল ফিকার' বইয়ে একটি বক্তব্য পেশ করেছেন। তিনি বলেন, এই ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য এবং সঠিক কথা হচ্ছে— 'ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ কোনো ছাহাবী হতে কোনো হাদীছ বর্ণনা করেছেন একথা প্রমাণিত নয়। শারহু নুখবাতিল ফিকারে আল্লামা মুহাম্মাদ আকরাম হানাফী আল্লামা সাখাবী হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মোল্লা আলী ক্বারী 'শারহু শারহে নুখবাতুল ফিকার' গ্রন্থে সাখাবী হতে বর্ণনা করেন, নির্ভরযোগ্য কথা হচ্ছে- ছাহাবীদের সাক্ষাৎ লাভের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ বয়সে ছোট হওয়ার কারণে ছাহাবীদের থেকে তার কোনো বর্ণনা নেই। আকরাম হানাফী 'ইমআনুন নাযার ওয়াত তাওযীহ নুখবাতুল ফিকার' গ্রন্থে হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে 'মাধ্যম' স্বল্প হওয়া বিষয়ক আলোচনায় বলেছেন, (১) الثلاثيات للبخاري অর্থাৎ তিন জনের মাধ্যমে বর্ণিত ইমাম বুখারীর বর্ণনাকৃত হাদীছ। (২) والثنائيات في مؤطأ إمام مالك অর্থাৎ দুই জনের মাধ্যমে বর্ণিত মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালেকে বর্ণিত হাদীছসমূহ। (৩) والواحد في حديث إمام أبي حنيفة অর্থাৎ এক জনের মাধ্যমে ইমাম আবূ হানীফার বর্ণনাকৃত হাদীছ।

৩. তাযকিরাতুল মাওযূআত, 'মাবহাছুল আয়িম্মাতুল আরবাআ' পৃ. ১১১।

তারপর তিনি বলছেন, لكن الأخير بسند غير مقبول إذا المعتمد أنه لا رواية للإمام أبي حنيفة عن أحد من الصحابة انتهى كلامه 'কিন্তু শেষের কথাটি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা নির্ভরযোগ্য বক্তব্য হচ্ছে, কোনো ছাহাবী হতে ইমাম আবূ হানীফার কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না।[৪]

ক্বাযী আল্লামা শামসুদ্দীন ইবনু খল্লীকান وفيات الأعيان গ্রন্থে বলেন, 'ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ চার জন ছাহাবীকে পেয়েছেন। তারা হচ্ছেন— ১. বাছরা নগরীতে আনাস ইবনু মালেক (২) কূফা নগরীতে আব্দুল্লাহ ইবনু আবী আওফা (৩) মদীনা নগরীতে সাহল ইবনু সা'দ আস-সাঈদী (৪) মক্কা নগরীতে আবূ তুফায়েল ইবনু আমের ইবনু ওয়াছেলা। কিন্তু তিনি তাদের কারো সাথে সাক্ষাৎ করেননি। তিনি তাদের কারো থেকে কোনো হাদীছ বর্ণনা করেননি। তবে তার সাথীগণ বলে থাকে যে, তিনি একদল ছাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং তাদের থেকে তিনি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বিষয়টি মুহাদ্দিছগণের নিকট প্রমাণিত নয়'।[৫]

জবাব : তার উক্তি أدرك أبو حنيفة أربعة من الصحابة এর অর্থ হলো, তিনি তাদের যুগ পেয়েছেন। যেমনটি শায়েখ ইবনু তাহের স্পষ্ট করে বলেছেন, তিনি তাদের কারো সাথে সাক্ষাৎ করেননি। আর এই কথাটি ন্যূনতম জ্ঞানের অধীকারী ব্যক্তির নিকটও সুস্পষ্ট।

মুসলিম গ্রন্থের ব্যাখ্যাকার ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ 'তাহযীবুল আসমা' নামক গ্রন্থে বলেন, শায়খ আবূ ইসহাক্ব রহিমাহুল্লাহ তার ত্ববাক্বাত নামক গ্রন্থে বলেন, নু'মান ইবনু ছাবেত ইবনু যূত্বা ইবনু মাহ মাওলা তায়মুল্লাহ ইবনু ছা'লাবা ৮০ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেছেন। ১৫০ হিজরী সনে বাগদাদ নগরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তখন তার বয়স ৭০ বছর। তিনি হাম্মাদ ইবনু আবূ সুলায়মান থেকে ফিক্বহের জ্ঞান লাভ করেন। তিনি আরো বলেন, আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ-এর যুগে চার জন ছাহাবী জীবিত ছিলেন— (১) আনাস ইবনু মালেক (২) আব্দুল্লাহ ইবনু আওফা (৩) সাহল ইবনু সা'দ (৪) আবূ তুফায়েল। তবে তিনি তাদের কারো থেকে কোনো হাদীছ বর্ণনা করেননি'।[৬]

ইমাম আবূ হানীফা নু'মান ইবনু ছাবেত ইবনু যূত্বা ইবনু মাহ কূফী তায়মুল্লাহ ইবনু ছা'লাবার মাওলা ছিলেন। তিনি হামযা

৪. শারহু শারহি নুখবাতুল ফিকার, পৃ. ৬২০; ফতহুল মুগীছ, ৩/১১।
৫. ওফায়াতুল আ'ইয়ান, 'তরজুমাতু আবী হানীফা' পৃ. ১৬৩।
৬. তাহযীবুল আসমা' তরজমাতু আবী হানীফা হরফুল জা' ফিল কুনা, ২/২১৬।

আয-যাইয়াত-এর গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন। তিনি একজন রেশম ব্যবসায়ী ছিলেন, রেশমবস্ত্র বিক্রয় করতেন। তার দাদা বনূ তায়ম গোত্রের দাস ছিলেন এবং কাবুল বা বাবেল-এর অধিবাসী ছিলেন। পরবর্তীতে তাকে আযাদ করে দেওয়া হয়। ইমাম আবূ হানীফা (রহিমাহুল্লাহ)-এর পৌত্র ইসমাঈল ইবনু হাম্মাদ ইবনু আবূ হানীফা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমরা পারস্যের স্বাধীন অধিবাসী ছিলাম। আমাদের উপর কখনোই দাসত্বের শৃঙ্খলা লাগেনি। আমার দাদা ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাকে বাল্যকালে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সান্নিধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি তাঁর ও তাঁর ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বরকতের দু'আ করেন। তিনি বিশুদ্ধ তথ্যানুযায়ী ১৫০ হিজরী সনে বাগদাদ নগরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তার যুগে চার জন ছাহাবী বেঁচে ছিলেন— (১) আনাস ইবনু মালেক (২) আব্দুল্লাহ ইবনু আওফা (৩) সাহল ইবনু সা'দ (৪) আবূ তুফায়েল। তবে তিনি তাদের কারো সাথে সাক্ষাৎ করেননি এবং তাদের কারো থেকে কোনো ধরনের হাদীছ বর্ণনা করেননি। তাঁর সঙ্গীরা বলে থাকেন, তিনি একদল ছাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং তাদের থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাদের এই বক্তব্য মুহাদ্দিছগণের নিকট প্রমাণিত নয়।[৭]

জবাব : শায়েখ তথা 'মাজমাউল বিহার' গ্রন্থের লেখক ইসমাঈল ইবনু হাম্মাদ ইবনু আবূ হানীফা (রহিমাহুল্লাহ)-এর উক্তি পেশ করেছেন বিশদ তাহক্বীক্বের ভিত্তিতে তার বক্তব্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে এবং তার মিথ্যা দাবীর ব্যাপারে সতর্ক করার লক্ষ্যে। কেননা তার বক্তব্য প্রমাণ করে যে, তার পূর্ববর্তীরা বংশগতভাবেই স্বাধীন ছিলেন। তবে তাহক্বীক্বী কথা হচ্ছে, দাসত্ব। যেমনটি তিনি তার পূর্বের বক্তব্যে সুস্পষ্ট করেছেন। 'তাক্বরীব' গ্রন্থে হাফেয ইবনু হাজার (রহিমাহুল্লাহ), 'তাহযীব' গ্রন্থে ইমাম নববী (রহিমাহুল্লাহ), 'ওয়াফিইয়াতুল আ'ইয়ান' গ্রন্থে আল্লামা ইবনু খাল্লীকানসহ আরো অনেকেই বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। সার কথা হচ্ছে— 'ইসমাঈলের দাদা ইমাম আবূ হানীফা (রহিমাহুল্লাহ)-কে নিয়ে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট নিয়ে যাওয়া হয় এবং তিনি তাঁর এবং তাঁর ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বরকতের দু'আ করেন', মর্মে বক্তব্যটি উল্লেখিত চার জন মনীষীসহ অনেক মনীষীর নিকট বাস্তবতাবিরোধী। এমনকি কোনো মূর্খ ব্যক্তিও এই কথা বলেনি। সুতরাং প্রকৃত আলেমগণ এই বক্তব্য দিতে পারেন না।

কেননা আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইমাম আবূ হানীফা (রহিমাহুল্লাহ)-এর জন্মের ৪০ বছর পূর্বে ইহলোক ত্যাগ করে পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন। যেমনটি ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) 'তাক্বরীব' গ্রন্থে এবং আরো অনেকেই স্পষ্ট করেছেন।

সুতরাং কোনো সন্দেহ রইল না, যে দাদা তাকে নিয়ে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট গিয়েছিলেন, সে দাদা দ্বারা আরো ঊর্ধতন দাদা উদ্দেশ্য। কেননা ইসমাঈলের যেই দাদা বাগদাদ নগরীতে ১৫০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেছেন, যেমনটি তার বক্তব্য দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, তিনি ইমাম আবূ হানীফা (রহিমাহুল্লাহ) ছাড়া আর কেউ নন।

এই হোঁচট খাওয়ার জায়গায় হাফেয দারায পেশাওরী (রহিমাহুল্লাহ) ও ধোঁকা খেয়েছেন এবং সঠিক তথ্য উদ্ঘাটনে ব্যর্থ হয়েছেন। যেমনটি তিনি প্রথম ফারসী ভাষায় তরজমাকৃত ছহীহ বুখারীর প্রথম খণ্ডে 'মানাক্বিবে ইমাম আবূ হানীফা'-তে লিখেছেন, ইসমাঈল ইবনু হাম্মাদ বলেছেন, আমার দাদা আবূ হানীফা (রহিমাহুল্লাহ) ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছাবেত তাঁকে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট নিয়ে যান। তখন ইমাম আবূ হানীফা (রহিমাহুল্লাহ)-এর বয়স নয় বছর ছিল। তখন আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর জন্য দু'আ করেছিলেন যেন আল্লাহ তাঁর এবং তাঁর বংশধরদের মধ্যে অগণিত কল্যাণ ও বরকত দান করেন।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই সমস্ত মানুষ 'কোনো বস্তুর ভালোবাসা তাকে অন্ধ ও বধির বানিয়ে দেয়' এই রোগে আক্রান্ত। আরো বিস্ময়কর ব্যাপার হলো— এমন তথ্যহীন বিষয় উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে তারা নিজেদের লজ্জা-শরমের বিষয়টিও চিন্তা করে না। কেননা আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর মৃত্যুসাল কোথায় আর ইমাম আবূ হানীফা (রহিমাহুল্লাহ)-এর জন্মসাল কোথায়!

'যে জন ফুল নিয়ে করে তাহক্বীক্ব তদন্ত
যদি নাহি রাখে তারা পূর্ণ বুৎপত্তি তবে হয় লজ্জায় অবনত।
নীরবতা বিনে যে আলোচনার নেই কোনো প্রতিষেধক
তবুও শুরু করে তারা অশ্লীল ও গর্হিত বাক্য প্রয়োগ।'

হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) তাক্বরীবুত তাহযীব গ্রন্থ বলেন, النعمان بن ثابت الكوفي أبو حنيفة الإمام أصله من فارس ويقال مولى بني تيم فقيه مشهور من السادسة 'নু'মান ইবনু ছাবেত আল-কূফী আবূ হানীফা (যিনি ইমাম ছিলেন)। বলা হয়ে থাকে, তিনি বংশগতভাবে পারস্যের। আবার কেউ বলেন, তিনি বনূ তায়ম গোত্রের মাওলা ছিলেন। তিনি ষষ্ঠ ত্ববাক্বার প্রসিদ্ধ একজন ফক্বীহ ছিলেন'।[৮]

(চলবে)

৭. মাজমাউল বিহার, 'নাওউন ফী বা'যিস ছাহাবা ওয়াত তাবেঈন' ৫/৩০১।

৮. তাক্বরীবুত তাহযীব, পৃ. ৩৫৮।

জ্ঞানীদের গুণাবলি

-মো. তরিকুল ইসলাম*

জ্ঞানী সদা সম্মানের পাত্র। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানী কে? কী তার গুণাবলি? এ সম্পর্কে আল-কুরআনের সূরা আর-রাদের ১৯ থেকে ২৪ আয়াতে খুব সুন্দর বিবরণ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ - الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ - وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ - وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ - جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ - سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾

‘আপনার রব হতে আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তা যে ব্যক্তি সত্য বলে জানে, সে কি তার মতো, যে অন্ধ? উপদেশ গ্রহণ করে শুধু বিবেকসম্পন্নগণই। যারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না। আর আল্লাহ যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আদেশ করেছেন যারা তা অক্ষুণ্ন রাখে, তাদের রবকে ভয় করে এবং ভয় করে কঠোর হিসাবকে। আর যারা তাদের রবের সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধৈর্যধারণ করে এবং ছালাত ক্বায়েম করে, আর আমরা তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং ভালো কাজের দ্বারা মন্দ কাজকে প্রতিহত করে, তাদের জন্যই রয়েছে আখেরাতের শুভ পরিণাম। স্থায়ী জান্নাত, তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতা-মাতা, স্ত্রীগণ ও সন্তানসন্ততিদের মধ্যে যারা সৎ কাজ করেছে তারাও। আর ফেরেশতাগণ তাদের কাছে উপস্থিত হবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে এবং বলবে, তোমরা ধৈর্যধারণ করেছ বলে তোমাদের প্রতি শান্তি। আর আখেরাতের এ পরিণাম কতই না উত্তম’ *(আর-রা‘দ, ১৩/১৯-২৪)*।

আল্লাহ তাআলা কুরআনকে নাযিল করেছেন যাতে এর আয়াতগুলো বুঝা যায়, সেগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা যায় এবং সেগুলো নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করা যায়। শুধু তেলাওয়াত করাই মূল লক্ষ্য নয়। আমরা এখানে সূরা আর-রা‘দের আয়াতগুলো একটু বুঝার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা এখানে প্রশ্নের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করছেন, যে ব্যক্তি অহীকে সত্যায়ন করে, কোনো সন্দেহ করে না এবং সেই অনুযায়ী আমল করে আর যে অহী থেকে অন্ধ, কুরআন ও সুন্নাহ জানার চেষ্টা করে না আবার জানলেও সে অনুযায়ী আমল করে না, তারা কখনোই সমান হতে পারে না। তাদের মধ্যে আসমান ও যমীনের ব্যবধান।[১] আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে অনেক জায়গায় এমন কথা বলেছেন। কোথাও তিনি বলেছেন যে, ‘জানা ব্যক্তি আর না জানা ব্যক্তি সমান নয়’ *(আয-যুমার, ৩৯/৯)*। আবার কোথাও বলেছেন যে, ‘জান্নাতী আর জাহান্নামী সমান নয়’ *(আল-হাশর, ৫৯/২০)*। এটি স্পষ্ট বুঝা গেলেও এখান থেকে উপদেশ গ্রহণ করে শুধু যারা জ্ঞানী, যাদের বিবেক আছে। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে, উপদেশ গ্রহণ করা জ্ঞানীদের বৈশিষ্ট্য।

তারপর জ্ঞানী মানুষদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করছেন। তিনি বলেন, ﴿الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ ‘যারা আল্লাহ তাআলার সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে’। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে যেসব বিধিনিষেধ দিয়েছেন, তারা সেগুলো পালন করে। আল্লাহর হক্ব ও বান্দার হক্ব দুটোই এর অন্তর্ভুক্ত। জ্ঞানীগণ আল্লাহর হক্ব ও বান্দার হক্ব পালন করে অঙ্গীকার পূর্ণ করে। পক্ষান্তরে, মুনাফিক্বরা এর বিপরীত করে। এরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে নিজেদেরকে জ্ঞানী ভাবে আর মুমিনদেরকে নির্বোধ মনে করে যেমনটি আল্লাহ তাআলা সূরা আল-বাক্বারাতে উল্লেখ করেছেন। অথচ প্রকৃতপক্ষে এরাই বোকা। তারপর আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ﴾ ‘তারা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না’। আল্লাহ ও তাদের মাঝে যে প্রতিজ্ঞা আছে, সেগুলো তারা ভঙ্গ করে না। সাথে সাথে বান্দার সাথেও যদি তাদের কোনো প্রতিজ্ঞা, চুক্তি, সন্ধি থাকে, তাহলে তাও তারা ভঙ্গ করে না।

﴿وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ﴾ ‘আল্লাহ যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আদেশ করেছেন, তারা তা অক্ষুণ্ন রাখে’। দ্বীনের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সকল বিষয় এর অন্তর্ভুক্ত।

জ্ঞানী মানুষ তার মাঝে ও আল্লাহ তাআলার মাঝে সম্পর্ক বজায় রাখে। ফলে তারা একমাত্র আল্লাহ তাআলারই ইবাদত করে, তার সাথে কোনো কিছুকে শরীক করে না। একমাত্র তাঁকেই ভয় করে, তাঁরই অভিমুখী হয়, তাঁরই ওপর ভরসা করে। সাথে সাথে আল্লাহর দেওয়া নেয়ামতসমূহকে স্বীকার করে এবং এর শুকরিয়াস্বরূপ তারা এসব নেয়ামতকে আল্লাহর নাফরমানীতে কাজে লাগায় না; বরং যাতে আল্লাহ খুশি হন, একমাত্র সেগুলোতেই কাজে লাগায়। তাছাড়াও তারা তাদের ভুলত্রুটির জন্য একমাত্র তাঁরই কাছে তাওবা করে। মোটকথা, তারা তাদের সার্বিক জীবনে তাওহীদকে

* গবেষণা সহকারী, আল-ইতিছাম গবেষণা পর্ষদ।

১. তাফসীরে সা‘দী, সূরা আর-রা‘দ এর ১৯ নং আয়াতের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে এবং নিজেদেরকে শিরক থেকে দূরে রাখার মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে।

জ্ঞানী মানুষগণ আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাথেও সম্পর্ক বজায় রাখে। ফলে তারা সেই রাসূল ﷺ-এর ওপর ঈমান আনে, তার দেওয়া সকল সংবাদকে সত্যায়ন করে, তার যথাযথভাবে অনুসরণ করে, তার দেওয়া ফয়সালাকে তারা মেনে নেয় এবং মনের মধ্যে কোনো ধরনের সংকোচ রাখে না। সাথে সাথে তারা তাকে নিজেদের সন্তানসন্ততি, পিতা-মাতা এমনকি নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসে।

জ্ঞানী মানুষ পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী, দাস-দাসী, দূরের ও কাছের প্রতিবেশীদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে। তারা সফরের সঙ্গীদের সাথেও সম্পর্ক বজায় রাখে। তারা নিজেদের জন্য যা ভালোবাসে, তা অপর মুসলিম ভাইয়ের জন্যও ভালোবাসে। তারা অন্যদের থেকে যে আচরণ আশা করে, মানুষদের সাথে তেমনই আচরণ করে। এমনকি তারা তাদের দুই কাঁধের ফেরেশতাগণের সাথেও সম্পর্ক বজায় রাখে। তারা তাদেরকে সম্মান করে এবং তাদেরকে লজ্জা করে যেমন একজন লোক তার পাশের সাথীকে দেখে লজ্জা করে। যার ফলে তারা গোপনেও কোনো পাপের কাজ করে না।[২]

তারপর আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ﴾ ‘তারা তাদের রবকে ভয় করে এবং ভয় করে কঠোর হিসাবকে’। অন্তরে আল্লাহ তাআলার ভয় না থাকলে তিনি যেসব সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে বলেছেন, সেগুলো অক্ষুণ্ন রাখা সম্ভব নয়। আল্লাহর ভয় এবং কিয়ামতের দিবসে হিসাবের ভয়ে তারা পাপ কাজের দিকে যায় না। বরং আল্লাহ তাআলা যে আদেশ করেছেন, সেগুলো তারা যথাযথভাবে পালন করে।

﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ﴾ ‘আর যারা তাদের রবের সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধৈর্যধারণ করে’। ধৈর্য হলো স্বভাববিরুদ্ধ বিষয়গুলোতে অস্থির না হওয়া, সৃষ্টির কাছে অভিযোগ ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ থেকে জবানকে বিরত রাখা, গাল চাপড়ানো এবং জামাকাপড় ছেঁড়া থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বিরত রাখা।[৩]

আল্লাহর হুকুম বা বিধান দুই প্রকার : সৃষ্টিগত ও শরীআতগত। মানুষের জীবনে কিছু কষ্টের ঘটনাসহ তাক্বদীরের সকল বিষয় এই সৃষ্টিগত বিধানের অন্তর্ভুক্ত। আর শরীআতগত বিধানগুলো হলো আল্লাহর আদেশ ও নিষেধসমূহ। তাক্বদীরে নির্ধারিত কষ্টকর বিষয়গুলোতে যেমন ধৈর্যধারণ করতে হয়, ঠিক তেমনই আল্লাহর আদেশ পালনে এবং তার নিষেধকৃত কাজগুলো থেকে বাঁচতেও ধৈর্যের প্রয়োজন। অনেক মানুষ আছে, তারা আল্লাহর আনুগত্যে ধৈর্যধারণ করে, কিন্তু হারাম থেকে বাঁচতে পারে না। আবার অনেকেই এর উল্টা। আবার অনেকেই তাদের জীবনের সামান্য কিছু অপ্রীতিকর ঘটনাতেই ভেঙে পড়ে, অস্থির হয়ে পড়ে। এরা জ্ঞানী নয়। বরং জ্ঞানী হলো তারাই যারা আল্লাহর আদেশ পালনে, নিষেধকৃত কাজগুলো থেকে বাঁচতে এবং তাক্বদীরে নির্ধারিত অপ্রীতিকর ঘটনাতে ধৈর্যধারণ করে। তারা কোনো অবস্থাতেই অস্থির হয়ে পড়ে না। অস্থিরতা বা ধৈর্যহীনতাকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, তোমার পিতা কে? তখন সে উত্তরে বলবে, অক্ষমতা বা দুর্বলতা। আর জ্ঞানী বা বুদ্ধিমানকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, তোমার পিতা কে? তখন সে উত্তরে বলবে, ধৈর্য।[৪] তাই জীবনে ধৈর্য ছাড়া চলার উপায় নেই। কারণ মানুষের নাফসে আম্মারা তাকে আল্লাহর পথ থেকে শয়তানের পথের দিকে নিয়ে যেতে চায়। মানুষের নফস হলো একটি বাহন, যাতে আরোহণ করে সে জান্নাতে অথবা জাহান্নামে দিকে চলে। আর ধৈর্য হলো সেই বাহনের লাগাম।[৫] যদি বাহনের লাগাম না থাকে, তাহলে যেকোনো সময় সে বিপথে যাবে, ঠিক তেমনই মানুষের ধৈর্য না থাকলে সে আল্লাহর পথে টিকে থাকতে পারবে না। সে তখন শয়তানের বাহিনীতে পরিণত হবে। এমনকি কোনো কোনো সময় শয়তানই তার বাহিনীতে পরিণত হয়।[৬]

এখানে আল্লাহ তাআলা বলছেন, জ্ঞানীগণ ধৈর্যধারণ করে, কিন্তু সেই ধৈর্যধারণ একমাত্র আল্লাহকে খুশি করার জন্য, অন্য কারো জন্য নয়।

﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ ‘ছালাত কায়েম করে’। তিনি বলেননি যে, তারা ছালাত আদায় করে। কারণ শুধু বাহ্যিক আকৃতিতে ছালাত আদায় করা যথেষ্ট নয়। বরং ছালাত ক্বায়েম হলো, ছালাতের রুকনসমূহ, ওয়াজিবসমূহ এবং সুন্নাতসমূহ পরিপূর্ণভাবে আদায় করে বাহ্যিকভাবে ছালাত ক্বায়েম করা। সাথে সাথে ছালাতের রূহ অর্থাৎ অন্তরকে ছালাতে হাযির করে যেটি বলছে এবং যে কাজ করছে সেগুলো গভীরভাবে চিন্তা করার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণভাবে ছালাত ক্বায়েম করা। আর এই রকম ছালাতের ব্যাপারেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘নিশ্চয় ছালাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে’ *(আল-আনকাবূত, ২৯/৪৫)*। আর এতেই ছওয়াব অর্জিত হয়। কারণ ছালাতের মধ্যে যতটুকু অংশে মানুষ মনোযোগ দেয় বা বুঝে, শুধু ততটুকু অংশে ছওয়াব পায়, অন্য অংশে নয়। ফরয ও নফল ছালাতসমূহও আয়াতে বর্ণিত ছালাতের

২. ইবনুল ক্বাইয়িম, উদ্দাতুছ ছবেরীন, পৃ. ৫০-৫১-এর আলোকে।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।

অন্তর্ভুক্ত।[৭] আয়াতে বর্ণিত ছালাত ও ধৈর্য হলো দুনিয়া ও আখেরাতের সকল কল্যাণ অর্জনে সহায়ক। এজন্য আল্লাহ তাআলা বলছেন, 'তোমরা ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। আর এটি বিনয়ী ছাড়া অন্যদের জন্য খুবই কঠিন' *(আল-বাক্বারা, ২/৪৫)*।

﴿وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾ 'আর আমরা তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে'। ফরয ব্যয়সমূহ যেমন— যাকাত, স্ত্রী, নিকটাত্মীয় ও দাস-দাসীসহ অন্যদের জন্য ব্যয় করা এবং নফল ব্যয়সমূহ যেমন— সকল কল্যাণকর রাস্তায় ব্যয় করা। এই দুই ধরনের ব্যয়ই আয়াতে বর্ণিত ব্যয় বা খরচের অন্তর্ভুক্ত। কাদের জন্য খরচ করবে সেটি কিন্তু আয়াতে বলা হয়নি। এর কারণ হলো যাতে করে অনেক প্রকার মানুষদের জন্য ব্যয় করা যায়। কেননা দান করা আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের অন্যতম উপায়। আয়াতে বর্ণিত من শব্দটি প্রমাণ করে, সম্পদের কিছু অংশ দান করতে হবে। এটি দিয়ে আল্লাহ তাআলা মানুষদের জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তিনি শুধু তাদের থেকে তাদের সম্পদের সামান্য পরিমাণই চান, যাতে তাদের কোনো ক্ষতিও না হয় এবং বোঝাও না হয়ে যায়। বরং তাদের এই দান বা ছাদাক্বা দ্বারা যাতে তারা নিজেরাও উপকৃত হয় এবং তাদের ভাইয়েরাও উপকৃত হয়।

﴿رَزَقْنَاهُمْ﴾ 'আমরা তাদেরকে জীবিকা হিসেবে দিয়েছে'। এটি দিয়ে ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে যে, তোমাদের যেসব সম্পদ রয়েছে, সেগুলো তোমাদের শক্তিবলে অর্জিত হয়নি এবং তোমরা সেগুলোর মালিকও নও। বরং এগুলো আল্লাহ তাআলার রিযিক যেগুলো একমাত্র তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন। যেহেতু একমাত্র তিনিই তোমাদের এসব দান করেছেন এবং তার বহু বান্দার মধ্যে বিশেষভাবে তোমাদের অনুগ্রহ করেছেন, সেহেতু তোমরা তার দেওয়া এসব অনুগ্রহ থেকে দান করার মাধ্যমে এবং তোমাদের অভাবী ভাইদের সান্ত্বনা দেওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করো।

কুরআনে অনেক জায়গায় ছালাত আর যাকাতকে পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ ছালাত হলো মা'বূদ অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার জন্য ইখলাছ বা একনিষ্ঠতা আর যাকাত ও ছাদাক্বা হলো বান্দার জন্য ইহসানস্বরূপ। বান্দার সৌভাগ্য ও কল্যাণের লক্ষণ হলো তার মা'বূদের জন্য ইখলাছ বা একনিষ্ঠতা রাখা এবং সৃষ্টির কল্যাণ বা উপকারের জন্য চেষ্টা করা। পক্ষান্তরে, বান্দার দুর্ভাগ্যের লক্ষণ হলো এই দুইটি অর্থাৎ ইখলাছ ও ইহসানের কোনোটিই না থাকা।[৮]

﴿وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ﴾ 'ভালো কাজের দ্বারা মন্দ কাজকে প্রতিহত করে'। জ্ঞানী মানুষগণ তাদের সাথে কেউ মূর্খামি করলে তারা সেই মন্দকে মন্দ দিয়ে নয়, বরং তারা ভালো দিয়ে প্রতিহত করে। নবী ﷺ-দের দিকে দৃষ্টি দিন। তারা কীভাবে মন্দকে ভালো দ্বারা প্রতিহত করেছেন। আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যেন এখনো নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখছি, যখন তিনি একজন নবী ﷺ-এর অবস্থা বর্ণনা করছিলেন যে, তাঁর স্বজাতিরা তাঁকে প্রহার করে রক্তাক্ত করে দিয়েছে আর তিনি তাঁর চেহারা হতে রক্ত মুছে ফেলছেন এবং বলছেন, হে আল্লাহ! আমার জাতিকে ক্ষমা করে দাও, যেহেতু তারা জানে না।[৯] সুবহানাল্লাহ! একটু চিন্তা করুন, এখানে সেই নবী ﷺ তাদেরকে শুধু ক্ষমাই করেননি; বরং তাদের জন্যও ক্ষমা প্রার্থনাও করছেন। আবার তিনি তাদের জন্য ওযরও পেশ করছেন যে, তারা জানে না।[১০]

এই প্রতিহত করাকে আরেকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেটি হলো তারা পাপকে নেকী দিয়ে প্রতিহত করে। অর্থাৎ তাদের দ্বারা কোনো পাপ কাজ হলেই তারা ভালো কাজ করে। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন, 'নিশ্চয় ভালো কাজ মন্দ কাজকে মিটিয়ে দেয়' *(হূদ, ১১/১১৪)*। নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআযকে রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেছিলেন, 'মন্দ কাজের পরপরই ভালো কাজ করো, তাতে মন্দ দূরীভূত হয়ে যাবে'।[১১]+[১২]

এসকল গুণ যাদের মধ্যে আছে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে স্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। এমনকি তাদের পিতা-মাতা, সন্তানসন্ততি ও স্ত্রীদের মধ্যে যারা ভালো কাজ করেছে, তাদেরকেও এই লোকদের সাথেই জান্নাতে স্থান দিবেন। দুনিয়াতে ধৈর্যের সাথে জীবন অতিবাহিত করার জন্য ফেরেশতাগণ তাদেরকে সালাম দিবেন।

উক্ত আয়াতগুলো থেকে আরও বুঝা যায় যে, আল্লাহ তাআলা এই সকল লোকদেরকে তাদের আমলের বিনিময়ে জান্নাত দিবেন। সুতরাং জান্নাতে প্রবেশের জন্য আমলের প্রয়োজন। আমলকারীর ওপরেই আল্লাহ তাআলা রহম করবেন। আর সেই রহমতের ফলেই জান্নাতে যাবে। উক্ত আয়াতগুলোতে জাবরিয়াদেরও খণ্ডন বিদ্যমান। কারণ জাবরিয়ারা বান্দার ইচ্ছাকে সাব্যস্ত করে না। অথচ আয়াতগুলোতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বান্দা এই আমলগুলো নিজেদের ইচ্ছাতেই করে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এই আমলগুলো করতে বাধ্য করেন না।

আল্লাহ তাআলা যেন আমদের ইলমকে আরও বাড়িয়ে দেন এবং এই ইলম দ্বারা আমাদেরকে উপকৃত করুন- আমীন!

৭. তাফসীরে সা'দী, সূরা আল-বাক্বারার ৩ নং আয়াতের আলোচনা দ্রষ্টব্য।
৮. প্রাগুক্ত।
৯. ছহীহ বুখারী, হা/৩৪৭৭।
১০. বাদাই' ফাওয়ায়েদ, ২/৭৭৩।
১১. তিরমিযী, হা/১৯৮৭।
১২. উদ্দাতুছ ছবেরীন, পৃ. ৫৩।

একটি লিফলেটের ইলমী জবাব

-আহমাদুল্লাহ*

(শেষ পর্ব)

১১. তারাবীহ'র নামায বিশ রাকআত : এই শিরোনামে লেখক তিনটি হাদীছ পেশ করেছেন। যার সবগুলোই নানান দোষে দুষ্ট। নিচে হাদীছগুলোর ধারাবাহিক তাহক্বীক্ব পেশ করা হলো।-

عن ابن عباس ﷺ أن رسول الله ﷺ كان يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر.

(১) হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূল সা. রমজানে বিশ ও বিতর পড়তেন। (মুছান্নাফে ইবনে আবি শায়বা ৫/২২৫, হাদীস নং ৭৭৭৪)

তাহক্বীক্ব : এই হাদীছটি বানোয়াট ও মনগড়া। মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ (২/৩৯৪) গ্রন্থে এই রেওয়ায়াতটি 'ইবরাহীম ইবনু উছমান আল-হাকাম হতে, তিনি মিকসাম হতে, তিনি ইবনু আব্বাস হতে'-এর সনদে রয়েছে। এর রাবী ইবরাহীম সম্পর্কে আল্লামা যায়লাঈ হানাফী (মৃ. ৭৬২ হি.) বলেছেন, 'আহমাদ বলেছেন, তিনি মুনকারুল হাদীছ'।[১]

আল্লামা যায়লাই হানাফী নাছবুর রায়াহ গ্রন্থে (২/৬৬) তার একটি হাদীছকে যঈফ বলেছেন এবং বায়হাক্বী হতে এই উক্তিটি 'তিনি যঈফ' বর্ণনা করেছেন (২/৬৭)। আর (২/১৫৩-এর মধ্যে) আবুল ফাতহ সুলাইম ইবনু আইয়ূব আর-রাযী আল-ফক্বীহ হতে এই উক্তিটি বর্ণনা করেছেন যে, তার যঈফ হওয়ার উপর ঐকমত্য আছে।

আইনী হানাফী বলেছেন, শু'বাহ তাকে (ইবরাহীম ইবনু উছমানকে) মিথ্যুক বলেছেন। আহমাদ, ইবনু মাঈন, বুখারী, নাসাঈ প্রমুখ বিদ্বানগণ তাকে যঈফ বলেছেন। আর ইবনু আদী তার এই হাদীছটিকে তার আল-কামিল গ্রন্থে তার মুনকার বর্ণনাসমূহের মধ্যে উল্লেখ করেছেন।[২]

ইবনু হুমাম হানাফী ফাতহুল ক্বাদীর (১/৩৩৩) গ্রন্থে ও আব্দুল হাই স্বীয় ফাতাওয়া গ্রন্থে (১/৩৫৪) এই হাদীছটির উপর সমালোচনা করেছেন। আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী দেওবন্দী এই হাদীছটি সম্পর্কে লিখেছেন, وأما عشرون ركعة فهو عنه بسند ضعيف وعلى ضعفه اتفاق 'আর ২০ রাকআত— যেটি মুহাম্মাদ ﷺ হতে যঈফ সনদে বর্ণিত, সেটির দুর্বল হওয়ার উপর ঐকমত্য আছে।[৩]

তারা ব্যতীত আরও অসংখ্য দেওবন্দী আলেম এই হাদীছ এবং এর রাবীর সমালোচনা করেছেন। যেমন দেখুন— মুহাম্মাদ যাকারিয়া কান্ধালবী দেওবন্দী তাবলীগীর 'আওজাযুল মাসালিক' (১/৩৯৭) গ্রন্থটি।

আবূ শায়বা ইবরাহীম ইবনু উছমানের উপর মুহাদ্দিছগণের কঠিন সমালোচনামূলক উক্তিগুলোর জন্য দেখুন— মীযানুল ই'তিদাল (১/৪৭, ৪৮), তাহযীবুত তাহযীব (১/১৪৪, ১৪৫) ইত্যাদি। আল্লামা সুয়ূতী এই হাদীছের রাবীর উপর কঠিন সমালোচনা করেছেন এবং বলেছেন, هَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ جِدًّا لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ 'এই হাদীছটি অত্যন্ত যঈফ। এর দ্বারা দলীল পেশ করা যাবে না'।[৪]

সুতরাং এর কোনো সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা অর্জিত হয়নি। বরং বড় বড় আলেমগণ যেমন হাফেয যাহাবী, আল্লামা যায়লাঈ, আল্লামা আইনী, ইবনু হুমাম রহিমাহুল্লাহ প্রমুখ বিদ্বানগণ তো একে বাতিল করে দিয়েছেন। অর্থাৎ এই রেওয়ায়াতটিকে সকলেই বাতিল করেছেন। সেজন্য সাধারণ লোকদের ধোঁকা দেওয়া অত্যন্ত নিকৃষ্ট কাজ।

عن السائب بن يزيد ﷺ قال كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب ﷺ في شهر رمضان بعشرين ركعة قال وكانوا يقرءون بالمئين وكانوا يتوكئون على عصيهم في عهد عثمان بن عفان ﷺ من شدة القيام.

(২) হযরত ছায়েব ইবনে ইয়াজিদ রা. বলেন, মুসলমানগণ হযরত উমরের যুগে রমজান মাসে বিশ রাকআত তারাবীহ'র নামায পড়তেন। (বায়হাক্বী শরীফ ২/৪৯৬)

তাহক্বীক্ব : শায়েখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ এ হাদীছের একাধিক ত্রুটি বর্ণনা করেছেন। যেমন এর রাবী ইবনু খুসায়ফাকে ইমাম আহমাদ মুনকারুল হাদীছ বলেছেন। এছাড়াও তিনি তারাবীহর সংখ্যা বর্ণনায় ভুল করেছেন।[৫]

كان أبي بن كعب ﷺ يصلي بالناس في رمضان بالمدينة عشرين ركعة ويوتر بثلاث.

(৩) হযরত উবাই ইবনে কাআব রা. রমজান মাসে মদীনায় বিশ রাকআত তারাবিহ ও তিন রাকআত বিতর পড়াতেন। (মুছান্নাফে ইবনে আবি শায়বা ৫/২২৪, হাদীস নং ৭৭৬৬)

তাহক্বীক্ব : এই রেওয়ায়াত সম্পর্কে হানাফীদের বিখ্যাত আলেমে দ্বীন নিমাবী সাহেব লিখেছেন, আব্দুল আযীয ইবনু

---

* সৈয়দপুর, নীলফামারী।

১. নাসবুর রায়াহ, ১/৫৩।
২. উমদাতুল ক্বারী, ১/১২৮।
৩. আল-আরফুশ শাযী, ১/১৬৬।
৪. আল-হাবী, ১/৩৪৭।
৫. আলবানী, ছালাতুত তারাবীহ, পৃ. ৫৮-৬০।

রুফাঈ উবাই ইবনু কা'বকে পাননি।[৬] অর্থাৎ এই রেওয়ায়াতটি মুনক্বাত্বে'। উছূলে হাদীছের গ্রন্থে লেখা আছে, মুনক্বাত্বে' বর্ণনা আলেমদের ঐকমত্যানুসারে যঈফ।[৭]

১২. মহিলাদের নামাযের উত্তম স্থান নিজ গৃহ (বাড়ি) : এই শিরোনামে তিনি চারটি দলীল পেশ করেছেন। যার আলোচনা নিম্নরূপ-

عن أم سلمة ﵂ عن رسول الله ﷺ انه قال خير مساجد النساء قعر بيوتهن.

(১) হযরত উম্মে সালামা রা.-এর সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূল সা. ইরশাদ করেন, গৃহাভ্যন্তরই হলো মহিলাদের জন্য উত্তম মসজিদ। (মুছনাদে আহমাদ হাদীস নং ২৬৫৪২)

তাহক্বীক্ব : হাদীছটির সনদ যঈফ। তবে হাদীছটির মর্ম ছহীহ। কেননা এর পক্ষে আরও সাক্ষীমূলক হাদীছ রয়েছে। কিন্তু এই হাদীছটি আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে পেশ করা অনর্থক। কারণ এতে সালাফীদের মতের বিরুদ্ধে কোনো কিছুই বলা নেই। কেননা সালাফীদের মতামত হলো, মহিলারা মসজিদে গিয়ে জামাআতে ছালাত আদায় করতে পারবে। তবে বাড়িই হলো তাদের উত্তম স্থান। সুতরাং এ হাদীছের সাথে আহলেহাদীছদের মতের কোনো বিরোধ নেই।

حدثنا هارون حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني داود بن قيس عن عبد الله بن سويد الأنصاري عن عمته أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي أنها جاءت النبي ﷺ فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك قال قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي قال فأمرت فبني لها مسجد في أقصى بيت في بيتها وأظلمه فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل.

(২) একদা হযরত উম্মে হুমাইদ রা. রাসূল সা.-এর দরবারে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার সাথে নামায পড়তে ভালবাসি। রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, আমি জানি তুমি আমার সঙ্গে নামায পড়তে ভালবাস, কিন্তু তোমার ঘরে নামায তোমার বাইরের হুজরায় নামায অপেক্ষা উত্তম। আর তোমার হুজরার নামায তোমার বাড়িতে নামায অপেক্ষা উত্তম। আর তোমার বাড়িতে নামায তোমার মহল্লার মসজিদে নামায অপক্ষো উত্তম। আর তোমার মহল্লার মসজিদে নামায আমার মসজিদে ছালাত অপেক্ষা উত্তম। অতঃপর উক্ত মহিলা নিজ ঘরের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নামাযের স্থান নির্ধারণ করে নিল এবং আমরণ সেখানেই নামায আদায় করল। (মুছনাদে আহমাদ হাদীস নং ২৬৫৪২)

তাহক্বীক্ব : এখানে নারীদের মসজিদে গিয়ে জামাআতে ছালাত আদায় করা হারাম করা হয়নি। বরং কোনটা অনুত্তম ও কোনটা উত্তম, তা নির্দেশ করা হয়েছে। যেহেতু লিফলেটের লেখক নারীদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করেন, সেহেতু তার উচিত ছিল এমন একটি হাদীছ দেখানো, যেখানে নারীদেরকে মসজিদে যেতে সরাসরি বাধা প্রদান করা হয়েছে।

عن عائشة ﵂ قالت لو أدرك رسول الله ﷺ ما أحدث النساء لمنعهن المسجد.

(৩) হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি হুজুর রা. মহিলাদের অশোভনীয় পরিবর্তন পরিলক্ষিত করতে পারতেন, যা তারা ঘটিয়েছে, তবে অবশ্যই তাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করে দিতেন। (বুখারী ১/১২০ (৮৬৯) মুসলিম ১/১৮৩ (৯৯৮)

তাহক্বীক্ব : প্রথমত, হাদীছটিতে তাদের জন্য কোনো দলীল নেই, যারা মহিলাদেরকে মসজিদে গমনে বাধা প্রদান করেন। কেননা এতে পরিষ্কারভাবে বলা আছে যে, 'যদি রাসূল ﷺ মহিলাদের অশোভনীয় আচরণ দেখতে পেতেন, তাহলে তিনি নিষেধ করতেন' —কিন্তু বাস্তবতা হলো, তিনি নিষেধ করেননি। আর তার মৃত্যুর পর আর কোনো ব্যক্তিরও নতুন করে শরীআতে এ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জারী করার ক্ষমতা নেই। কেননা শরীআতের আদেশ-নিষেধ যা অবতীর্ণ হওয়ার, তা রাসূল ﷺ-এর জীবদ্দশায় হয়েছে। তাঁর তিরোধানের পর আর কোনো নতুন আদেশ-নিষেধ যুক্ত হবে না।

দ্বিতীয়ত, এটি আয়েশা ﵂-এর নিজস্ব ধারণা ছিল, যা কোনো দলীল নয়। তবে যদি সকল ছাহাবী ইজমা করে মহিলাদের মসজিদ গমনে নিষেধাজ্ঞা জারী করতেন, তাহলে তা সঠিক হতো। কেননা ছাহাবীদের ইজমা দলীল হয়ে থাকে। আর তাঁদের ইজমা হাদীছ কর্তৃক স্বীকৃতি প্রাপ্ত। বিস্তারিত দেখুন শায়েখ যুবায়ের আলী যাঈ ﵀ প্রণীত 'ইসলামে তাক্বলীদের বিধান' গ্রন্থটি।

عن عبد الله بن عمر أنه كان لا يخرج نساءه في العيدين.

(৪) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রা. হতে বর্ণিত যে, তিনি তাঁর পরিবারের মেয়েদেরকে দুই ঈদের নামাযের জন্য বের

৬. আছারুস সুনান, হা/৭৮১-এর টীকা দ্রষ্টব্য।
৭. তায়সীরু মুছত্বলাহিল হাদীছ, পৃ. ৭৮।

হতে দিতেন না। (মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা ৪/২৩৪, হাদীস নং ৫৮৪৫)

তাহক্বীক্ব : সনদ যঈফ। কেননা এখানে সুফিয়ান ছাওরী রহিমাহুল্লাহ-এর তাদলীস রয়েছে।[৮]

১৩. জুমআ ও ঈদ একই দিনে হলে উভয়টি পড়তে হবে : লিফলেটটির শেষ বিষয়টি এটাই। এখানে মুহতারাম লেখক নিম্নোক্ত বর্ণনা পেশ করেছেন—

كان رسول الله ﷺ يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين.

"রাসূলুল্লাহ সা. দুই ঈদে ও জুমআয় 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আলা' এবং 'হাল আতাকা হাদীসুল গাশিয়াহ' পড়তেন। আর যখন ঈদ ও জুমআ একই দিনে হতো, তখনও তিনি ঈদ ও জুমআ উভয় নামাযে উক্ত সূরা দু'টিই পড়তেন।" (মুসলিম ১/২৮৮ হা: নং ১৪৫৮)

তাহক্বীক্ব : এটি ছহীহ মুসলিমের হাদীছ। সুতরাং অবশ্যই হাদীছটি ছহীহ। কিন্তু আমাদের দেখতে হবে যে, এই ছহীহ হাদীছটির ব্যাখ্যা অন্য কোনো ছহীহ হাদীছে আছে কি না। এ ব্যাপারে কয়েকটি হাদীছ নিম্নরূপ—

হাদীছ-১ : ইয়াস ইবনু আবী রমলা আশ-শামী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীছ :

عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ الشَّامِيِّ قَالَ شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ قَالَ أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ صَنَعَ قَالَ صَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ.

মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে জিজ্ঞেস করেন যে, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে তার সাথে দুই ঈদ (ঈদ ও জুমআ) একই দিনে অনুষ্ঠিত হতে দেখেছেন? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কী করেছিলেন? তিনি বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে ঈদের ছালাত আদায় করেন। অতঃপর জুমআর ছালাত আদায়ের ব্যাপারে অবকাশ প্রদান করে বলেন, 'যে ব্যক্তি তা আদায় করতে চায়, সে তা আদায় করতে পারে'।[৯]

হাদীছ-২ : আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীছ :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ.

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আজকের এই দিনে দুইটি ঈদ (ঈদ ও জুমআ) এর সমাগম ঘটেছে। কেউ চাইলে ঈদের ছালাতে উপস্থিত হওয়া তার জন্য জুমআর ছালাতে উপস্থিত হওয়ার পরিবর্তে যথেষ্ট হবে। আমরা জুমআর ছালাত পড়ব'।[১০]

হাদীছ-৩ : ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা-এর হাদীছ :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى بِالنَّاسِ ثُمَّ قَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَأْتِهَا وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتَخَلَّفَ فَلْيَتَخَلَّفْ.

ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যামানায় দুই ঈদ (জুমআ ও ঈদ) এর সমাগম হলো। তিনি লোকদের নিয়ে (ঈদের) ছালাত আদায় করার পর বললেন, 'যে ব্যক্তি জুমআর ছালাতে আসতে চায়, সে আসতে পারে। আর কেউ না আসতে চাইলে সে না আসতে পারে'।[১১]

হাদীছ-৪ : ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা-এর হাদীছ :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ إِنْ شَاءَ اللهُ.

রাসূলুল্লাল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আজকের এই দিনে দুই ঈদের সমাগম ঘটেছে। কেউ চাইলে ঈদের ছালাতে উপস্থিত হওয়া তার জন্য জুমআর ছালাতে উপস্থিত হওয়ার পরিবর্তে যথেষ্ট হবে। ইনশাআল্লাহ আমরা জুমআর ছালাত আদায় করব'।[১২]

এছাড়াও আরও আছার রয়েছে। যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঈদ ও জুমআ একত্র হলে জুমআ না পড়লেও যথেষ্ট হবে।

উপসংহার : লিফলেটে প্রদত্ত ১৩টি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত জবাব এখানেই সমাপ্ত হলো। আল্লাহ আমাদের সঠিকভাবে দ্বীন শেখার ও বুঝার তাওফীক্ব দান করুন। আমাদের সকলকে হক্ব বুঝার ও সালাফদের দেখানো পথে অটল থাকার তাওফীক্ব দিন- আমীন!

---

৮. ইবনু হাজার, ত্বাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন, রাবী নং ৫১।
৯. আবূ দাঊদ, হা/১০৭০; ইবনু মাজাহ, হা/১৩১০; তামামুল মিন্নাহ, পৃ. ৩৪৪, হাদীছ ছহীহ।
১০. আবূ দাঊদ, হা/১০৭৩, হাদীছ ছহীহ।
১১. ইবনু মাজাহ, হা/১৩১২, হাদীছ ছহীহ।
১২. ইবনু মাজাহ, হা/১৩১১, হাদীছ ছহীহ।

মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার ১০টি উপায়

-আতাউর রহমান*

জীবনধারণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন আদানপ্রদান বা লেনদেনে অনেক কিছু না পাওয়ার আঘাতে হতাশ হই আমরা। হয়ে পড়ি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। শয়তানের প্ররোচনায় হতাশ হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় অনেক মানুষ। ইসলাম মানুষকে হতাশ না হওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করেছে। এককথায় ইসলামে হতাশার কোনো স্থান নেই। নানাবিধ দুশ্চিন্তা ও হতাশার কারণে মানুষের মাঝে এক ধরনের চাপ সৃষ্টি হয়। সাধারণত এটাকে মানসিক চাপ বলে। এসব মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পেতে ইসলামে রয়েছে অনেক দিক-নির্দেশনা, যা মেনে চললে মানসিক চাপ দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। নিম্নে সে দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করা হলো :

(১) প্রতিদিন নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করা : কুরআন তেলাওয়াত মানুষের অন্তরকে প্রফুল্ল করে তোলে। কেননা কুরআন তেলাওয়াত মুমিনের মনের প্রফুল্লতার অনন্য উৎস। শুধু তাই নয়, কুরআন তেলাওয়াতে মুমিনের মনের প্রফুল্লতার সাথে সাথে মানসিক প্রশান্তি বাড়তে থাকে। কুরআনের আলোয় আলোকিত হয়ে মানুষ দুনিয়ার সব দুশ্চিন্তা ও হতাশা থেকে থাকে মুক্ত। কারণ যখন কেউ কুরআন তেলাওয়াত করে, তখন তার উপর শান্তি এবং রহমত বর্ষিত হয়। এই সম্পর্কে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ و مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِن بُيُوْتِ اللهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ و يَتَدَارَسُوْنَه بَيْنَهُمْ إلا نَزَلَتْ عليهم السَّكِيْنَةُ و غَشِيَتْهم الرَّحْمَة وحَفَّتْهُمُ المَلائِكَةُ و ذَكَرَهم اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ.

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যখন কোনো সম্প্রদায় আল্লাহর ঘরসমূহের মধ্যে কোনো এক ঘরে একত্রিত হয়ে আল্লাহর কিতাব পাঠ করে এবং তা নিয়ে পরস্পরের মধ্যে অধ্যয়ন করে, তখন তাদের উপর (আল্লাহর পক্ষ থেকে) প্রশান্তি অবতীর্ণ হয় এবং তাদেরকে রহমত ঢেকে নেয়। আর ফেরেশতাগণ তাদেরকে ঘিরে ফেলেন। আর আল্লাহ তাআলা স্বয়ং তাঁর নিকটস্থ ফেরেশতামণ্ডলীর কাছে তাদের কথা আলোচনা করেন’।[১] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﷺ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سورةَ الكَهْفِ و عِنْدَهُ فَرَسٌ مَرْبُوْط بِشَطَنَيْنِ فَتَغَشَّته سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدُوْرُ و تَدْنُوْ و جَعَلَ فَرَسُه يَنْفِرُ منها فلما أَصْبَحَ أَتَى النبي ﷺ فَذَكَرَ ذلك له فقال تلك السَّكِيْنَة تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآن.

বারা ইবনু আযেব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা একটি লোক সূরা আল-কাহফ পাঠ করছিলেন। তার পাশেই দু’টি রশি দিয়ে একটি ঘোড়া বাঁধা ছিল। এক খণ্ড মেঘ লোকটিকে ঢেকে নিল এবং নিকটবর্তী হতে থাকল। ঘোড়াটি তা দেখে ছুটে পালাচ্ছিল। অতঃপর যখন সকাল হলো, তখন লোকটি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গিয়ে উক্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন। তা শুনে তিনি বললেন, ঐটি প্রশান্তি ছিল, যা কুরআন তেলাওয়াতের কারণে অবতীর্ণ হয়েছে’।[২]

উক্ত হাদীছ দু’টি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরআন তেলাওয়াত করলে শান্তি ও রহমত বর্ষণ হয়। আর এই শান্তি ও রহমত বর্ষণের ফলে তেলাওয়াতকারীর পেরেশান ও মানসিক চাপ দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

(২) ছালাতের প্রতি যত্নবান হওয়া এবং বেশি বেশি নফল ছালাত আদায় করা : যে কোনো বিপদ-মুছীবত, পেরেশানির সময় ছালাতের মাধ্যমেই প্রকৃত প্রশান্তি লাভ করা যায়। কেননা ছালাতের মাধ্যমেই বান্দা মহান আল্লাহর সাহায্য লাভ করে থাকে। তাই মানসিক প্রশান্তি লাভে ছালাতের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া খুবই জরুরী। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ ‘আর তোমরা ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও’ *(আল-বাক্বারা, ২/৪৫)*।

তাছাড়া মানুষ অনেক সময় অন্যায়, অশ্লীল পাপ কর্মে লিপ্ত হওয়ার কারণে হতাশ, চিন্তা ও পেরেশানিতে থাকে। আর এ কথা সত্য যে, ছালাতের মাধ্যমেই অন্যায়, অশ্লীল কাজ থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ ‘আপনি ছালাত ক্বায়েম করুন, নিশ্চয় ছালাত অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে’ *(আল-আনকাবূত, ২৯/৪৫)*।

আর অবশ্যই এটা এক বিরাট সাহায্য। মানুষ যখন এসব অন্যায় থেকে বেঁচে থাকতে পারবে তখন তার দুশ্চিন্তা, পেরেশানি থাকবে না। ফলে অন্তরে প্রশান্তি আসবে এবং মানসিক চাপ দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

---

* শিক্ষক, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বীরহাটাব-হাটাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৯৯; আবূ দাঊদ, হা/১৪৫৫; ইবনু মাজাহ, হা/২২৫।

২. ছহীহ বুখারী, হা/৫০১১; ছহীহ মুসলিম, হা/৭৯৫।

এছাড়া ছালাতের মাধ্যমে রিযিকের মধ্যে প্রশান্তি আসে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾ ‘আর আপনি আপনার পরিবার-পরিজনকে ছালাত আদায়ের আদেশ করেন এবং নিজেও তার উপর অবিচল থাকুন। আমি আপনার কাছে কোনো রিযিক চাই না। আমিই আপনাকে রিযিক দিব। আর শুভ পরিণাম তো তাক্বওয়াতেই নিহিত’ *(ত্বা-হা, ২০/১৩২)*। ইমাম ইবনু কাছীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, إذا أَقَمْتَ الصلاةَ أتاك الرزقُ من حيث لا يَحْتَسِبْ ‘যখন আপনি ছালাত আদায় করবেন, তখন আপনার কাছে এমনভাবে রিযিক আসবে যে, আপনি বুঝতেই পারবেন না’।[৩]

উপরে উল্লেখিত আয়াতে আলাদা আলাদা দুটি নির্দেশ রয়েছে: (ক) পরিবারবর্গকে ছালাতের আদেশ করা। (খ) নিজেও ছালাত অব্যাহত রাখা। এর এমন ফলাফল সামনে এসে যাবে, যাতে আপনার হৃদয় উৎফুল্ল হয়ে উঠবে। আপনি যদি ছালাত ক্বায়েম করেন, তবে আপনার রিযিকে কোনো ঘাটতি হবে না। কোথা থেকে রিযিক আসবে, আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। আর এজন্যই রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) যখন কোনো বিষয়ে সমস্যায় পড়তেন বা কোনো চিন্তাগ্রস্ত হতেন, তখনই তিনি ছালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন। হাদীছে এসেছে,

عَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى.

হুযায়ফা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) যখন কোনো বিষয়ে সমস্যার সম্মুখীন হতেন, তখন ছালাত আদায় করতেন।[৪] সুতরাং যেকোনো বিপদাপদ ও সমস্যায় ছালাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক তাজা করে নেওয়ার মাধ্যমে সাহায্য লাভ করা যেতে পারে। সালাফে ছালেহীন তথা ছাহাবী, তাবেঈ, তাবে তাবেঈ ও সত্যনিষ্ঠ ইমামগণ থেকে এ ব্যাপারে বহু ঘটনা বর্ণিত আছে।

(৩) বেশি বেশি ইস্তেগফার করা : মানসিক চাপ সামলাতে বেশি বেশি ইস্তেগফারের বিকল্প নেই। যেসব কারণে মানুষ মানসিক চাপে পড়ে, তন্মধ্যে অন্যায়-অপরাধ বেশি করা, অর্থকষ্টে থাকা, সন্তানসন্ততি ও জীবিকার অপ্রতুলতা ইত্যাদি। এসবের সমাধানে কুরআনের নির্দেশ হলো ইস্তেগফার করা। এ ইস্তেগফারেই মানুষ উল্লেখিত সমস্যা থেকে সামাধান খুঁজে পায় বলে আল্লাহ তাআলা নবী নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর মাধ্যমে ঘোষণা করেছেন। নবী নূহ (আলাইহিস সালাম) তাঁর জাতিকে বললেন, ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا - يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا - وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾ ‘অতঃপর আমি বললাম, তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। আর তোমাদেরকে ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি দিয়ে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের জন্য বাগ-বাগিচা দিবেন আর দিবেন নদীনালা’ *(নূহ, ৭১/১০-১২)*।

আল্লাহ তাআলা নবী মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর মাধ্যমে বলেন, ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ﴾ ‘আর তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে ক্ষমা চাও। অতঃপর তাঁর কাছে ফিরে যাও, তাহলে তিনি তোমাদেরকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত উত্তম ভোগ-উপকরণ দিবেন। আর প্রত্যেক আনুগত্যশীলকে তাঁর আনুগত্য মোতাবেক দান করবেন। আর যদি তারা ফিরে যায়, তবে আমি নিশ্চয় তোমাদের উপর বড় এক দিনের শাস্তির ভয় করছি’ *(হূদ, ১১/৩)*।

অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে পূর্বের গুনাহ হতে ক্ষমা চেয়ে আল্লাহর দরবারে ফিরে আসার আহ্বান জানাচ্ছি। আর এতে তোমরা দুনিয়ায় তোমাদের অবস্থান করার জন্য যে সময় নির্ধারিত রয়েছে, সেই সময় পর্যন্ত তিনি তোমাদের খারাপভাবে নয়; বরং ভালোভাবেই রাখবেন। তাঁর নেয়ামতসমূহ তোমাদের উপর বর্ষিত হবে। তাঁর বরকত ও প্রাচুর্য লাভে তোমরা ধন্য হবে। তোমরা সচ্ছল ও সুখী-সমৃদ্ধ থাকবে। তোমাদের জীবন শান্তিময় ও নিরাপদ হবে। তোমরা লাঞ্ছনা, হীনতা ও দীনতার সাথে নয়; বরং সম্মান ও মর্যাদার সাথে জীবনযাপন করবে। এই হলো ইস্তেগফার ও তওবার ফল।

বেশি বেশি ইস্তেগফার করলে বিপদ, দুশ্চিন্তা দূর হয় এবং রিযিকের ব্যবস্থা হয়। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَزِمَ الاستغفار جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا و مِنْ كُلِّ ضَيْقٍ مَخْرَجًا و رَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ.

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি নিয়মিত ইস্তেগফার করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে প্রত্যেক বিপদ থেকে রক্ষা করবেন, সকল দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করবেন এবং তাকে এমন উৎস থেকে রিযিক দিবেন, যা সে কল্পনাও করতে পারবে না’।[৫] ইমাম

৩. ইবনু কাছীর, ৫/৩২৭।
৪. আবূ দাঊদ, হা/১৩১৯, হাদীছ হাসান; মিশকাত, হা/১৩২৫।
৫. আবূ দাঊদ, হা/১৫১৮; ইবনু মাজাহ, হা/৩৮১৯।

ইবনুল মুনযির রহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে হাসান বলেছেন। কিন্তু অধিকাংশ মুহাদ্দিছ হাদীছটি দুর্বল বলেছেন। শায়েখ উছাইমীন রহিমাহুল্লাহ বলেন, এই হাদীছটি দুর্বল। কিন্তু তার অর্থ ছহীহ। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, আর তোমাদেরকে ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি দিয়ে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের জন্য বাগ-বাগিচা দিবেন আর দিবেন নদীনালা' *(নূহ, ৭১/১০-১২)*। আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন, 'আর তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে ক্ষমা চাও। অতঃপর তাঁর কাছে ফিরে যাও, তাহলে তিনি তোমাদেরকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত উত্তম ভোগ-উপকরণ দিবেন। আর প্রত্যেক আনুগত্যশীলকে তাঁর আনুগত্য মোতাবেক দান করবেন। আর যদি তারা ফিরে যায়, তবে আমি নিশ্চয় তোমাদের উপর বড় এক দিনের শাস্তির ভয় করছি' *(হূদ, ১১/৩)*। অতঃপর শায়খ উছায়মীন রহিমাহুল্লাহ বলেন, আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইস্তেগফার করা পাপ মোচন হওয়ার একটি মাধ্যম। আর যখন পাপ মোচন করে দেওয়া হয়, তখন মানুষের রিযিক অর্জন হয় এবং তার থেকে সকল দুঃখ-কষ্ট ও সকল চিন্তা দূর হয়ে যায়। অতএব হাদীছটির সনদ দুর্বল হলেও হাদীছের অর্থ ছহীহ।[৬] শায়খ ইবনু বায রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীছটি দুর্বল। কিন্তু ইস্তেগফারের ফযীলত ও এর প্রতি উৎসাহ প্রদান সম্পর্কে অনেক আয়াত ও বিশুদ্ধ হাদীছ রয়েছে।[৭]

(৪) বেশি বেশি দরূদ পাঠ করা : দুশ্চিন্তায় ও পেরেশানিতে বেশি বেশি দরূদ পাঠ করলে আল্লাহ তাআলা রহমত বর্ষণ করেন। আর এই রহমত মানুষকে যাবতীয় মানসিক চাপ থেকে মুক্ত করে। এটি মানবাত্মা প্রশান্তি লাভের সহজ উপায়ও বটে। দরূদ পাঠের মাধ্যমে দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি দূর হয়। আর এ বিষয়ে সুস্পষ্ট হাদীছ বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ﷺ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي فَقَالَ مَا شِئْتَ قُلْتُ الرُّبُعَ قَالَ مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ النِّصْفَ قَالَ مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ فَالثُّلُثَيْنِ قَالَ مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا قَالَ إِذًا تُكْفَى هَمَّكَ وَيُكَفَّرُ لَكَ ذَنْبُكَ.

উবাই ইবনু কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি তো আপনার প্রতি খুব অধিক হারে দরূদ পাঠ করি। আপনার প্রতি দরূদ পাঠের জন্য আমি আমার সময়ের কতটুকু খরচ করব? তিনি বললেন, তুমি যতক্ষণ ইচ্ছা কর। আমি বললাম, এক-চতুর্থাংশ? তিনি বললেন, তুমি যতটুকু ইচ্ছা কর। তবে এর চেয়ে অধিক পরিমাণে পাঠ করতে পারলে এতে তোমারই মঙ্গল হবে। আমি বললাম, তাহলে আমি কি অর্ধেক সময় দরূদ পাঠ করব? তিনি বললেন, তুমি যতক্ষণ ইচ্ছা কর। তবে এর চেয়ে বেশি পরিমাণে পাঠ করতে পারলে, সেটা তোমার জন্যই কল্যাণকর হবে। আমি বললাম, তাহলে দুই-তৃতীয়াংশ সময় পাঠ করব? তিনি বললেন, তুমি যতটুকু ইচ্ছা কর। তবে এর চেয়ে বেশি সময় পাঠ করলে তোমারই ভালো। আমি বললাম, তাহলে আমি আমার পুরো সময়টাই আপনার উপর দরূদ পাঠ করে কাটিয়ে দিব। তিনি বললেন, তাহলে তোমার চিন্তা ও দুঃখের জন্য যথেষ্ট হবে এবং তোমার পাপসমূহ ক্ষমা করা হবে'।[৮] অন্য এক হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ جِبْرِيلَ جاءني فقال مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا، وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ.

আনাস ইবনু মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'নিশ্চয় জিবরীল আলাইহিস সালাম আমার নিকট এসে বললেন, যে ব্যক্তি আপনার উপর একবার দরূদ পাঠ করে, আল্লাহ তাআলা তার উপর ১০ বার রহমত বর্ষণ করেন এবং ১০টি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন'।[৯] অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحَطَّ عَنْهُ عَشْرَ خَطِيئَاتٍ 'যে ব্যক্তি আমার উপর এক বার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশ বার রহমত বর্ষণ করবেন এবং তার থেকে দশটি পাপ মোচন করে দিবেন'।[১০] আরো একটি হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا 'যে ব্যক্তি আমার উপর এক বার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশ বার রহমত বর্ষণ করেন'।[১১]

সুধী পাঠক! উপরিউক্ত হাদীছগুলো দ্বারা চারটি বিষয় প্রমাণিত হয়। তা হলো— ১. দরূদ পাঠ করলে দুশ্চিন্তা ও দুঃখ-কষ্ট দূর হয়। ২. পাপ মোচন করা হয়। ৩. রহমত বর্ষণ হয়। ৪. মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়।

(চলবে)

৬. ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব, ইবনু উছায়মীন, ক্যাসেট নং ২৩৮।
৭. মাজমূ ফাতাওয়া ইবনে বায, ২৬/৯০।
৮. তিরমিযী, হা/২৪৫৭, হাদীছ হাসান; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/১৬৭০; মিশকাত, হা/৯২৯।
৯. সিলসিলা ছহীহা, ২/৩২৮; আদাবুল মুফরাদ, হা/৬৪২।
১০. মুসনাদে আহমাদ, হা/১২০১৭; আল-আদাবুল মুফরাদ, হা/৬৪৩, হাদীছ ছহীহ।
১১. ছহীহ মুসলিম, হা/৪০৮; মিশকাত, হা/৯২১

মাধ্যমিক স্তরে মানসম্মত শিক্ষাবিস্তারে প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা

-মো. আরিফুর রহমান*

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সময়ানুবর্তিতা : একজন প্রধান শিক্ষককে অবশ্যই সময়মতো সব কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। তিনি স্কুলটাইমের আগেই স্কুলে আসবেন। তিনি যদি দেরি করেন, তবে অন্যরা তাকে গুরুত্ব দিবে না। সময় মেনে চলা খুবই দরকারি। মিটিংয়ে তিনি আগেই আসবেন। ক্লাসে তিনি আগে যাবেন। এমনকি অ্যাসেম্বলিতে তাকে সময়মতো হাযির থাকতে হবে। প্রধান শিক্ষক এই সমস্ত কাজে প্রথমে আসলে বা সময় মেনে চললে সেটা অন্যদের অন্য অনুপ্রেরণার হয়। অন্যদের জন্য একটা অলিখিত কিন্তু খুবই কার্যকর মানসিক প্রেরণা দেয়। নিজের নিকটও সৎ থাকা যায়।

প্রতিদিন সকালে শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করা : স্কুলে এসে ক্লাস শুরু করার আগে প্রধান শিক্ষক সকল শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মচারিদের নিয়ে কোনো না কোনো দলগত কাজ করবেন। এ সমস্ত কাজের মাধ্যমে 'একটা টিম' এর মানসিকতা তৈরি হয় সবার ভিতর। এতে প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। একজন প্রধান শিক্ষককে অনেক ব্যস্ত থাকতে হয়। তারপরও পাঁচ মিনিট সময় বের করা যায়।

ছুটির দিনেও কাজ করা : শুধু স্কুলের অফিসিয়াল নিয়ম মেনে স্কুল চালালে তাতে উৎকর্ষ আসে না। প্রত্যেক সফল মানুষ গদবাধা নিয়মের বাইরেও কাজ করেই তবে সফল হয়েছে। স্কুলটাইমের আগে বা পরে এমনকি ছুটির দিনেও স্কুলের নানা রকম কাজ করা যায়। শিক্ষার্থীদের ক্লাবগুলোর কাজ দেওয়া যায়। সহপাঠক্রমিক কাজের অগ্রগতি জানার জন্য ছুটির দিন বা স্কুলটাইমের আগে বা পরে কাজ করা যেতে পারে। বিশেষ করে করোনা পরিরস্থিতি আমাদের শিক্ষাপরিবারের যে ক্ষতি করেছে তা পুষিয়ে নিতে ছুটির দিনেও কাজ করা প্রয়োজন।

ন্যায় বিচারের সংস্কৃতি তৈরি : প্রধান শিক্ষক হবেন দরদি। তাকে সাহসীও হতে হবে। তিনি অবশ্যই সৎ থাকবেন। স্কুলে সততার নীতি প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সহকারী শিক্ষকদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে যথাযথ। কাউকে বেশি গুরুত্ব দিবেন আর কাউকে অবহেলা করবেন তা হতে পারে না। কাউকে পকেটের লোক বানিয়ে রাখবেন আর কাউকে পাত্তা দিবেন না তা হতে পারে না। মানসম্মত শিক্ষা বিস্তারে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

ফ্রাইডে বক্স চালু : এটা চমৎকার একটি ধারণা। মূলত এটা ছিল 'সানডে বক্স'। অথবা এটিকে 'ট্যালেন্ট শো বক্স' নাম দেওয়া যেতে পারে। যে সমস্ত শিক্ষার্থী শুক্রবারে স্কুলে আসবে তারা কেবল এই সুযোগ পাবে। শিক্ষার্থীরা যে বিষয়ে পারদর্শী সে বিষয়ে কাগজে লিখে বক্সের ভিতর ফেলবে। প্রধান শিক্ষক বক্স থেকে কাগজ উঠাবেন। এক একজনকে পারফর্মেন্স করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা তাদের কর্মদক্ষতা উপস্থাপন করবে। স্কুলে একটা সুন্দর পরিবেশ তৈরি হবে। এতে করে পিছিয়ে থাকা শিক্ষার্থীরা অনুপ্রাণিত হবে। প্রধান শিক্ষক এই ধারণা বাস্তবায়ন করবেন। তিনি সহকারী শিক্ষক, বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদ, শিক্ষার্থী, সংশ্লিষ্ট সরকারি অফিস এবং অভিভাবকদের সাথে আলোচনা করে এই ধরনের অনেক কিছুই উদ্ভাবন করতে পারেন। এতে করে কমিউনিটি বুঝতে পারবে স্কুলের প্রধান শিক্ষক বা স্কুলটিম মানসম্মত শিক্ষা বিস্তারে সক্রিয়।

অভিভাবক শিক্ষক সভা/সম্পৃক্ততা : গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর বাবা-মায়েরা সন্তানদের শিক্ষার ব্যাপারে প্রায়শই তাদের ভূমিকা, দায়িত্ব এবং শিক্ষার অধিকার সম্পর্কে অসচেতন থাকেন। অভিভাবক-শিক্ষকদের সভায় সচেতনতাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে আলোচনা করতে হবে। প্রধান শিক্ষক স্কুলের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অভিভাবক, কমিউনিটির নেতা, বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদ এবং সরকারি কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ত রাখবেন। অবিভাবকরা যেন অনুভব করেন, তাদের সন্তান স্কুলে নিরাপদ। এই অনুভূতি আসবে যখন শিক্ষক এবং স্কুলটিম স্কুলে একটা আন্তরিক পরিবেশ তৈরি করতে পারবে। উন্নত স্কুলে অভিভাবকদের সাথে শিক্ষকদের আন্তরিক সম্পর্ক থাকে। বছরে অন্তত দুইবার অভিভাবকদের স্কুলে ডাকতে হবে। তাদের সাথে সন্তানদের আচার-আচরণ, পরীক্ষার ফলাফল ইত্যাদি বিষয়ে উন্মুক্ত আলোচনা করতে হবে। অভিভাবককে নিয়ম করে, মাসে একবার স্কুলে আসতে উৎসাহ দিতে হবে। অভিভাবক স্কুলে আসলে শিক্ষকদের উপর একটা লিখিত দায়ভার তৈরি হয়। একটা জবাবদিহিতার পরিবেশ তৈরি হয়। সন্তানরাও মনে করে তার অভিভাবক স্কুলে আসবে। অতএব তাকে সবকিছুতেই ভালো করতে হবে। এই কাজগুলো প্রধান শিক্ষক নেতৃত্ব দিয়ে করবেন।

* প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ভলান্টিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন ফর বাংলাদেশ এবং সাবেক ছাত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ইউনিফর্ম : স্কুলে অবশ্যই ইউনিফর্ম থাকবে। এটা একটা পরিচিতি। স্কুলের সবাই যে একই প্রতিষ্ঠানের এবং একই নীতি নিয়ে চলে তার একটা বাহ্যিক প্রমাণ হলো ইউনিফর্ম।

স্কুলের উন্নয়নে কমিউনিটির সহায়তা দাবি : স্কুল প্রায়শই কমিউনিটির নিকট স্কুলের উন্নয়নে সহযোগিতা চাইতে এগিয়ে যায় না। অথচ কমিউনিটিই অধিকাংশ স্কুল প্রতিষ্ঠা করে থাকে। সুতরাং প্রধান শিক্ষক কমিউনিটির সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখতে সচেষ্ট হবেন।

শিক্ষার্থী অ্যালামনাই : প্রধান শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অ্যালামনাই গঠন করতে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। একটি অ্যালামনাই স্কুলে অনেক রকম কাজে সহযোগিতা করতে পারে। অর্থ দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে, পরিকল্পনা করে অ্যালামনাই স্কুলের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে।

স্কুলের পরিছন্নতায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর উদ্যোগ : শুধু স্কুলের কর্মচারিরা নয়; শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্মিলিতভাবে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি হাতে নিতে পারেন। মাসে একবার এই অভিযান চালালে স্কুলের পরিবেশ সুন্দর থাকবে। একইভাবে স্কুলে ফুলের বাগান করা, স্কুলের আশেপাশে সমাজ সচেতনতামূলক র‍্যালি বের করতে পারে। এক এক র‍্যালিতে এক এক রকম স্লোগান যুক্ত করা যায়। প্রধান শিক্ষক শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মধ্যে এই দায়িত্ব বণ্টন করবেন।

প্রধান শিক্ষক/সহকারী শিক্ষকদের ক্লাস পর্যবেক্ষণ : ক্লাস পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। একজন সহকারী শিক্ষকের ক্লাস অন্য একজন সহকারী শিক্ষক সময় পেলে পিছনে বসে দেখবেন। কীভাবে তিনি ক্লাস নিচ্ছেন, শিক্ষার্থীরা কেমন উপভোগ করছেন তা দেখবেন। ক্লাস শেষে কোনো পরামর্শ থাকলে শিক্ষকদের অফিসে বসে সে বিষয়ে আলোচনা করবেন। প্রধান শিক্ষকও এই কাজটি করবেন। ক্লাস পর্যবেক্ষণের যাবতীয় বিষয় প্রধান শিক্ষক দেখভাল করবেন।

ইংরেজি ক্লাস ইংরেজিতেই : মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে ইংরেজি ক্লাস ইংরেজিতে পরিচালনার বিকল্প নেই। ইংরেজিকে সাবজেক্ট হিসাবে না দেখে একটা ভাষা হিসাবে ক্লাসে উপস্থাপন করতে হবে। বাংলা যেমন ভাষা, ইংরেজিও তেমন ভাষা। অনুশীলনের পরিবেশ পেলে শিক্ষার্থীরা স্বংক্রিয়ভাবে ইংরেজিতে কথা বলতে পারবে। ইংরেজি লিখতে পারবে। পরীক্ষায়ও ভালো করবে। মোটকথা, ক্লাসে ইংরেজিতে কথা বলার পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ, পাঠাভ্যাস, বারবার প্রশিক্ষণ : একজন শিক্ষক কি বছরে একবারই প্রশিক্ষণ নিবেন? কয়েক বছর পর একটা প্রশিক্ষণ কি যথেষ্ট? আপনারা কী মনে করেন? একটি প্রশিক্ষণের ১০%ও কি আমরা মনে রাখতে পারি? পৃথিবীর সব ভালো প্রতিষ্ঠানের আছে প্রশিক্ষণ নীতি। বারবার প্রশিক্ষণ ছাড়া শিক্ষকরা হালনাগাদ শিক্ষা বিজ্ঞান সম্পর্কে জানতে পারবেন না। প্রশিক্ষণ আমাদের গুণগত মান বাড়াতে সহায়ক। শিক্ষকরা বই পড়বেন। শিক্ষার্থীদেরকে পাঠক্রমের বাইরের বিভিন্ন বই পড়তে উৎসাহ দিবেন। যে শিক্ষক যত বেশি পড়বেন, তিনি তত জানবেন। যত বেশি জানবেন, তার আত্মবিশ্বাস তত বাড়বে। আত্মবিশ্বাস বাড়লে তার কর্মদক্ষতা বাড়বে।

বিষয়ভিত্তিক, শিক্ষাবিজ্ঞান এবং সমসাময়িক ও ইতিহাসবিষয়ক জ্ঞান : প্রধান শিক্ষক অবশ্যই বিষয়ভিত্তিক, শিক্ষাবিজ্ঞান এবং সমসাময়িক ও ইতিহাসবিষয়ক জ্ঞান রাখবেন। সহকারী শিক্ষকদেরকেও এই বিষয়ে উৎসাহ দিবেন।

সব শিক্ষার্থীকে ন্যায়বিচারের দৃষ্টিতে দেখবেন : শুধু প্রধানশিক্ষকই নন; সকল শিক্ষক মেধাবী শিক্ষার্থী এবং ব্যাকবেঞ্চারদের একই দৃষ্টিতে দেখবেন। কাউকে গুরুত্ব দিবেন আর কাউকে দিবেন না তা হতে পারে না। ভালো শিক্ষার্থীর নিকট বা প্রথম বেঞ্চের সবার নিকট প্রশ্ন করবেন আর কাউকে করবেন না তা চলবে না। প্রয়োজন হলে আজ পিছনের বেঞ্চ, কাল তার সামনের বেঞ্চ এমনভাবে প্রশ্ন করা যেতে পারে। শিক্ষকই ভালো জানবেন কীভাবে তিনি এটা করবেন।

প্রধান শিক্ষক হবেন পথপ্রদর্শক ও মেন্টর : প্রয়োজনে তিনি শিক্ষার্থীদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলবেন। সংশ্লিষ্ট অভিভাবকদের ডাকবেন। অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীকে আপন করে নিতে হবে। মানুষ একটা খারাপ ঘটনা ১০ জনের সাথে বললে ভালোটা বলে এক থেকে দুই জনের সাথে। সুনাম অর্জন করা খুবই কঠিন। তাই প্রধান শিক্ষক শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের নিকট হয়ে উঠবেন পথপ্রদর্শক।

বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব : প্রধান শিক্ষক তার দায়িত্বের বোঝা ভাগ করে দিবেন। আমরা প্রায়শই দেখি, প্রধান শিক্ষক কাজের চাপ ভাগাভাগি করেন না। দায়িত্ব হস্তান্তর করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না। সকল চাপ নিয়ে তিনি শিক্ষক এবং প্রশাসনের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। মানসম্মত শিক্ষা অর্জনে এটি নেতিবাচক ভূমিকা রাখে। বিভিন্ন প্রতিযোগিতার দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া যায়। প্রয়োজনে দায়িত্ব বদল করা যেতে পারে।

এছাড়াও আরও কিছু গুণ প্রধান শিক্ষক অনুশীলন করবেন। প্রধান শিক্ষক কর্তৃক পরীক্ষার হল পর্যবেক্ষণ, ক্লাসে বিনোদনের মাধ্যমে পাঠদান, বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন, স্কুল টিমকে নিয়ে পরিকল্পনা করা, নিয়মিত শিক্ষক সভা/প্রতিক্রিয়া সভা আহ্বান করা এবং সেখানে সকল খুঁটিনাটি বিষয়ে আলোচনা করা। আমাদের মনে রাখা জরুরী এই কাজ শুধু প্রধান শিক্ষকের নয়; স্কুলের সকলেই তাকে সহযোগিতা করবেন।

মূর্খদের সাথে বিতর্ক : শরীআত কী বলে?

-অধ্যাপক ওবায়দুল বারী বিন সিরাজউদ্দীন*

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৮) খেয়াল রাখবেন, মানুষের সাথে আপনার কথাবার্তা এবং আলাপ-আলোচনার উদ্দেশ্য যেন হয় সত্যে উপনীত হওয়া। সত্য আপনার মাধ্যমে উন্মোচিত হোক আর অন্য কারো মাধ্যমেই উন্মোচিত হোক, কার দ্বারা উন্মোচিত হলো সেটা বড় করে দেখবেন না। এক্ষেত্রে সত্যে উপনীত হওয়াটাই বড় কথা।

(৯) অন্যকে ছোট করা এবং অন্যের উপর জয়লাভ করার উদ্দেশ্যে অনর্থক তর্কে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকুন। অকারণে তর্কে লিপ্ত হওয়া বিপথগামিতার লক্ষণ। এ থেকে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহ কাউকে পথ দেখালে সে বিপথগামী হয় না কিন্তু তারা বিনা কারণে তর্কাতর্কিতে লিপ্ত হয়'। আপনি নিজে সঠিক হলেও বিতর্ক পরিহার করুন। আবূ দাঊদের একটি হাদীছে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'সঠিক হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি বিনা কারণে তর্ক করা বন্ধ করে, আমি জান্নাতে তার জন্য একটি ঘরের নিশ্চয়তা দিচ্ছি'।[১]

(১০) আপনার কথা হবে স্পষ্ট, সহজবোধ্য ও দুর্বোধ্য শব্দ হতে মুক্ত। প্রয়োজন না হলে বাগ্মিতা পরিহার করুন এবং মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে কিছু বলা থেকে বিরত থাকুন। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ধরনের কথা অপছন্দ করতেন। নবী করীম ﷺ বলেছেন, 'যাদেরকে আমি সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করি এবং যারা কিয়ামতের দিন আমার থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থান করবে, তারা হলো সেই সব লোক যারা অনর্থক কথা বলে, যারা অন্যকে ছোট করে এবং যারা কথা বলার সময় নিজেদের (পাণ্ডিত্য) যাহির করে'।[২]

(১১) আপনার কথা হবে শান্ত প্রকৃতির, পরিষ্কার, শ্রুতিগোচর এবং সর্বসাধারণের নিকট বোধগম্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ সকলের বুঝার সুবিধার্থে একটি কথা তিন বার পুনরাবৃত্তি করতেন। তাঁর কথা ছিল সহজ যা সকলেই বুঝতে পারতেন।

(১২) কথাবার্তায় আন্তরিক হোন। অযথা কৌতুক করবেন না। কথাবার্তায় হাস্যরস আনতে চাইলে সেইভাবে আনুন যেভাবে নবী মুহাম্মদ ﷺ তা করতেন।

(১৩) অন্যের কথায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করবেন না। কেউ কিছু বলতে চাইলে তা মনোযোগ দিয়ে শুনুন এবং তাকে তার কথা শেষ করতে দিন। তার কথা শোনার পর যদি আপনার পক্ষ থেকে ভালো এবং প্রকৃত অর্থেই প্রয়োজনীয় কিছু বলার থাকে তবেই সেটা বলুন। শুধু বলতে চাওয়ার স্বার্থেই অনর্থক কথা বলবেন না।

(১৪) কথা বলুন আর তর্কই করুন, তা করতে হবে উত্তম পন্থায়। এতে করে যেন কারও ক্ষতি না হয়, মানসিকভাবে কেউ যেন আঘাত না পায়, কাউকে খাটো করা না হয় বা কারও প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ প্রকাশ না পায়। সকল নবীর মাধ্যমেই মানুষকে সুন্দরভাবে কথা বলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা যখন মূসা আলাইহিস সালাম এবং তাঁর ভাই হারূন আলাইহিস সালাম-কে ফেরাউনের কাছে প্রেরণ করেছিলেন, তখন আল্লাহ তাঁদেরকে বলে দিয়েছিলেন, ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ 'তার সঙ্গে তোমরা নম্রভাবে কথা বলবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে কিংবা (আল্লাহকে) ভয় করবে' *(ত্বা-হা, ২০/৪৪)*।

বলাই বাহুল্য যে, আমরা কেউই মূসা আলাইহিস সালাম এবং হারূন আলাইহিস সালাম-এর থেকে উত্তম নই। আর আমরা যে লোকটির সাথে কথা বলছি সেই লোকটিও ফেরাউনের থেকে নিকৃষ্ট নন।

(১৫) অন্যদের কথাবার্তা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করবেন না, বিশেষ করে যখন দেখবেন যে, তারা যা বলছে তার মধ্যে যেমন ভুল বা মিথ্যা রয়েছে, তেমনি কিছু পরিমাণ সঠিক বা সত্য তথ্যও রয়েছে। কারণ সঠিক অংশটুকু প্রত্যাখ্যান করা মোটেও উচিত হবে না, যদিও তা ভুলের সাথে মিশিয়ে উপস্থাপন করা হয়। আপনাকে সঠিক ও সত্যটি গ্রহণ করতে হবে; ভুল ও মিথ্যাটি ত্যাগ করতে হবে। এটিই হলো ন্যায়বিচার এবং ইনছাফ যা করার জন্য আল্লাহ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন।

(১৬) মানুষের সামনে নিজের প্রশংসা করবেন না, নিজেই নিজেকে বাহবা দেবেন না। কারণ এমনটি করা উদ্ধত আচরণের পরিচায়ক, যা করতে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾

---

* পিএইচডি গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১. আবূ দাঊদ, হা/৪৮০০, হাদীছ হাসান।

২. তিরমিযী, হা/২০১৮, হাদীছ ছহীহ।

‘যারা বিরত থাকে বড় বড় পাপ আর অশ্লীল কার্যকলাপ থেকে ছোট-খাটো দোষ-ত্রুটি ছাড়া; বস্তুত তোমার প্রতিপালক ক্ষমা করার ব্যাপারে অতি প্রশস্ত। তিনি তোমাদের সম্পর্কে খুব ভালোভাবেই জানেন যখন তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন আর যখন তোমরা তোমাদের মায়েদের পেটে ভ্রূণ অবস্থায় ছিলে। কাজেই নিজেদেরকে খুব পবিত্র মনে করো না। কে তাক্বওয়া অবলম্বন করে তা তিনি ভালোভাবেই জানেন। অতএব তোমরা নিজেদের সাফাই গেয়ো না। তিনিই ভালো জানেন মুত্তাক্বী কে’ *(আন-নাজম, ৫৩/৩২)*। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘কেউ হেদায়েতের দিকে আহ্বান করলে যত জন তার অনুসরণ করবে প্রত্যেকের সমান ছওয়াবের অধিকারী সে হবে, তবে যারা অনুসরণ করেছে তাদের ছওয়াবে কোনো কমতি হবে না’।[৩]

সভ্য মানুষ অন্যকে গালি দেয় না। অশ্রাব্য ভাষায় কারো সঙ্গে কথা বলে না। ক্রোধে অগ্নিশর্মা হলেও মার্জিত শব্দ ব্যবহার করে। ভদ্র ও সংযতভাবে শোকজ করে। কিন্তু কিছু মানুষ রাগের আতিশয্যে হুঁশ-জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। অন্যকে অশ্লীল ও শ্রুতিকটু বাক্যবাণে নাজেহাল করে। গাল-মন্দ করে নিজের ভাবমূর্তি নষ্ট করে।

ইসলামে অন্যকে গালি দেওয়া সম্পূর্ণ হারাম। যেকোনো কারণেই হোক কাউকে গালি দেয়ার অনুমতি নেই। হাসি-কৌতুক ও ঠাট্টাচ্ছলেও অন্যকে গালি দেওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে অশোভনীয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ ‘যারা বিনা অপরাধে ঈমানদার পুরুষ ও নারীদের কষ্ট দেয়, তারা অবশ্যই মিথ্যা অপবাদ এবং স্পষ্ট অপরাধের বোঝা বহন করে’ *(আল-আহযাব, ৩৩/৫৮)*।

যার মধ্যে চারটি অভ্যাস আছে, তাকে হাদীছে মুনাফিক্ব বলা হয়েছে। এগুলোর কোনো একটি পাওয়া গেলেও সে মুনাফিক্ব হিসেবে ধর্তব্য হবে। হাদীছের আলোকে সেগুলো হলো- ‘যখন তাকে বিশ্বাস করা হয় সে বিশ্বাস ভঙ্গ করে, কথা বললে মিথ্যা বলে, অঙ্গীকার করলে ভঙ্গ করে এবং বিবাদ-বিতর্কে উপনীত হলে অন্যায় পথ অবলম্বন করে।[৪] অন্য হাদীছে আছে, ‘মুমিন কখনো দোষারোপকারী, অভিশাপদাতা, অশ্লীলভাষী ও গালিগালাজকারী হয় না’।[৫] আরেক হাদীছে রাসূল ﷺ বলেন, ‘মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেক্বী (আল্লাহর অবাধ্যাচরণ) এবং তার সঙ্গে লড়াই ঝগড়া করা কুফরী’।[৬] হাদীছে আরো এসেছে, ‘কবীরা গুনাহগুলোর একটি হলো নিজের বাবা-মাকে অভিশাপ করা’। জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! মানুষ নিজের বাবা-মাকে কীভাবে অভিশাপ করে? তিনি বললেন, ‘যখন সে অন্যের বাবাকে গালিগালাজ করে, তখন সে নিজের বাবাকেও গালিগালাজ করে থাকে। আর যে অন্যের মাকে গালি দেয়, বিনিময়ে সে তার মাকেও গালি দেয়’।[৭] আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন, ‘যে ব্যক্তি তার (কোনো মুসলিম) ভাইয়ের সম্মান নষ্ট করেছে অথবা কোনো বিষয়ে যুলুম করেছে, সে যেন আজই (দুনিয়াতে) তার কাছে (ক্ষমা চেয়ে) মিটিয়ে করে নেয়, ওই দিন আসার আগেই যেদিন দীনার ও দিরহাম কিছুই থাকবে না। তার যদি কোনো নেক আমল থাকে, তবে তার যুলুমের পরিমাণ অনুযায়ী তা থেকে নিয়ে নেওয়া হবে। আর যদি তার কোনো নেক আমল না থেকে, তবে তার সঙ্গীর পাপরাশি তার (যালেমের) উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে’।[৮]

আল্লাহ তাআলা আমাদের গালমন্দ ও অশ্লীল বাক্যবিনিময় থেকে রক্ষা করুন। মার্জিত ভাষা ও শ্রুতিমধুর শব্দ ব্যবহারের তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

৩. তিরমিযী, হা/২৬৭৪, হাদীছ ছহীহ।

৪. ছহীহ বুখারী, হা/৩৪; ছহীহ মুসলিম, হা/৫৮, ৫৯।

৫. তিরমিযী, হা/১৯৭৭, হাদীছ ছহীহ।

৬. ছহীহ বুখারী, হা/৭০৭৬; তিরমিযী, হা/১৯৮৩।

৭. ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৭৩; তিরমিযী, হা/১৯০২।

৮. ছহীহ বুখারী, হা/২৪৪৯, ৬৫৩৪।

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মৃত মুসলিমদের জন্য নিবেদিত আমলসমূহের প্রতিদান

মূল : ড. সাঈদ ইবনু আলী ইবনু ওয়াহাফ আল-ক্বাহত্বানী
*অনুবাদ : হাফীযুর রহমান বিন দিলজার হোসাইন**

ভূমিকা :

الْحَمْدُ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ، وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا، أما بعد:

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করি, তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। তাঁর কাছে স্বীয় কু-প্রবৃত্তি ও অসৎ কর্মের অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাই। তিনি যাকে হেদায়াত দান করেন, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ হেদায়াত দান করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত সত্য কোনো মা'বূদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। ছালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর পরিবারবর্গ, ছাহাবায়ে কেরাম এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত আগত তাঁর সকল অনুসারীর উপর।

ثواب القرب (ছাওয়াবুল কুরাব)-এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ :

শাব্দিক অর্থ : ثواب (ছাওয়াব), المثوبة এবং المثابة অর্থ— প্রতিদান, আনুগত্যের প্রতিদান, সৎ আমলের ছওয়াব।[১] আল্লাহ বলেন, ﴿وَلَوْأَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ 'আর তারা যদি ঈমান আনত এবং মুত্তাক্বী হতো, তবে আল্লাহর নিকট শ্রেষ্ঠতর প্রতিফল ছিল, যদি তারা জানত' *(আল-বাক্বারা, ২/১০৩)*। ইবনুল আছীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, (الثواب) শব্দটি أثاب إثابة - يثيب- এভাবে (ইলমুছ ছরফে বাবে إفعال থেকে) ব্যবহার হয়। الثواب শব্দটি বিশেষ্য। যা ভালো-মন্দ দু'টি ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়। তবে উক্ত শব্দটি ভালো ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ও অধিক হারে ব্যবহার হয়।[২]

পারিভাষিক অর্থ : সৎ আমলের প্রতিদানকে الثواب বলা হয়। الثواب মানেই হলো الأجر অর্থাৎ প্রতিদান।

القرب (কুরাব)-এর শাব্দিক অর্থ : قُرَبٌ বহুবচন। এর আরেকটি বহুবচন হলো قُرُبَاتٌ। একবচন হলো قُرْبَةٌ। আর قربان শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হলো قرابين। যেসব সৎকাজের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য হাছিল করা যায়, তা-ই হচ্ছে। যেমন- তুমি বলবে, আমি আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য কুরবানী করলাম। কোনো কিছুর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য বা সান্নিধ্য লাভ করাই হলো আল্লাহর কাছে সান্নিধ্য অনুসন্ধান করা।

পারিভাষিক অর্থ : যে সমস্ত আনুগত্যময় এবং সৎ আমলের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়, তাকে القرب বলা হয়।[৩] আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ 'কতক বেদুঈন আল্লাহকে ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে আর তারা যা আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাকে তারা আল্লাহর নৈকট্য ও রাসূলের দু'আ লাভের মাধ্যম মনে করে; সত্যিই তা তাদের (আল্লাহর) নৈকট্য লাভের মাধ্যম; অচিরেই আল্লাহ তাদেরকে তাঁর রহমতের মধ্যে প্রবিষ্ট করবেন; অবশ্যই আল্লাহ অতিক্ষমাশীল, অতিদয়ালু' *(আত-তওবা, ৯/৯৯)*।

যেসব আমলের ছওয়াব মৃত ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছে :

মৃত ব্যক্তির নিকট এমন সব আমলের ছওয়াব পৌঁছে, যে আমলগুলো মৃতব্যক্তি তার জীবদ্দশায় ঘটিয়েছে। দলীল—

১ম দলীল : আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ 'যখন কোনো মানুষ মৃত্যুবরণ করে, তখন তিনটি আমল ছাড়া (তার নিকট) সকল প্রকার আমলের ছওয়াব যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। ছাদাক্বা জারিয়া, এমন জ্ঞান রেখে যাওয়া, যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় এবং এমন সৎসন্তান, যে তার জন্য দু'আ করবে'।[৪]

২য় দলীল : আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ 'ঈমানদার ব্যক্তির মৃত্যুর

---

* নারায়ণপুর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

১. মুখতারুছ ছিহাহ, পৃ. ৩৮, ২২; মিছবাহুল মুনীর, ১/৮৬।

২. নিহায়াহ ফী গারীবিল হাদীছ, ১/২২৭।

৩. মিছবাহুল মুনীর, ২/৪৯৫; সা'দী আবূ জীব, আল-ক্বামূসুল ফিক্বহী, পৃ. ২৯৮; লুগাতুল ফুক্বাহাআ, পৃ. ১৩৫।

৪. ছহীহ মুসলিম, 'অছিয়ত' অধ্যায়, 'মানুষের মৃত্যুর পর যে সকল আমলের ছওয়াব তার কাছে পৌঁছে' অনুচ্ছেদ, হা/১৬৩১; মিশকাত, হা/২০৩।

পর তার যেসব আমল এবং তাঁর যেসব (পুণ্য) নেকী তার সাথে যুক্ত হয় তা হলো— যে ইলম (জ্ঞান) অন্যকে শিক্ষা দিয়েছে এবং তার প্রচার করেছে, তার রেখে যাওয়া সৎ সন্তান, কুরআন যা সে ওয়ারিছী সূত্রে রেখে গেছে অথবা মসজিদ, যা সে নির্মাণ করেছে অথবা মুসাফিরদের জন্য সরাইখানা নির্মাণ করেছে অথবা পানির কূপ যা সে খনন করেছে অথবা তার জীবদ্দশায় ও সুস্থাবস্থায় তার সম্পদ থেকে দান করেছে তা তার মৃত্যুর পরও তার সাথে (তার আমলনামায়) যুক্ত হবে'।[৫]

৩য় দলীল : মুআয ইবনু আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا فَلَهُ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهِ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْعَامِلِ 'যে ব্যক্তি জ্ঞান শিক্ষা দেয়, সে তদনুসারে আমলকারীর সমান প্রতিদান পাবে; এতে আমলকারীর প্রতিদানে কোনোরূপ ঘাটতি হবে না'।[৬]

৪র্থ দলীল : সাহল ইবনু সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খায়বারের দিনে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলেন, فَوَاللَّهِ لأَنْ يُهْدَى... بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ '...আল্লাহর কসম! যদি একজন ব্যক্তিও তোমার দ্বারা হেদায়াত লাভ করে, তবে তা তোমার জন্য লাল রঙের উটের চেয়েও উত্তম'।[৭]

উক্ত হাদীছটি মানুষকে কল্যাণময় কিছু শিক্ষা দেওয়ার এবং তাদের মাঝে জ্ঞান প্রসারের গুরুত্ব বর্ণনা করে। ইমাম খাত্বাবী (রাহিমাহুল্লাহ) উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك أجرا وثوابا من أن يكون لك حمر النعم فتتصدق بها 'তোমার লাল উট থাকা এবং তা ছাদাক্বা করার থেকে আল্লাহ তোমার মাধ্যমে একজন ব্যক্তিকে হেদায়াত করলে তা তোমার জন্য ছওয়াব এবং প্রতিদানের দিক থেকে অধিক উত্তম হবে'।[৮]

কুরতুবী, উব্বী এবং সানূসী (রাহিমাহুমুল্লাহ) উল্লেখ করেছেন যে, উক্ত হাদীছটিতে জ্ঞানার্জন করার, তা মানুষের মাঝে বিস্তার করার এবং ওয়ায-নছীহত করার প্রতি অনেক উৎসাহিত করা হয়েছে। অর্থাৎ একজন ব্যক্তিকে জ্ঞান (ইলম) শিক্ষা দেওয়ার এবং সঠিক পথের দিক-নির্দেশনা দেওয়ার ছওয়াব, অধিক মূল্যবান একটি উট ছাদাক্বা করার ছওয়াবের থেকে অধিক উত্তম। কেননা, দান-ছাদাক্বা করার ছওয়াবের ধারা মৃত্যুর পরে বন্ধ হয়ে যাবে। আর ইলম (জ্ঞান) শিক্ষা দেওয়া এবং (সৎ পথের) দিক-নির্দেশনার ছওয়াবের ধারা ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত বন্ধ হবে না'।[৯]

৫ম দলীল : আবূ মাসঊদ আনছারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ 'যে ব্যক্তি কাউকে কল্যাণের দিকে পথ দেখায়, সেও এর বিনিময়ে ছওয়াব পাবে যতটুকু ছওয়াব কল্যাণকারী লোকটি পাবে'।[১০]

৬ষ্ঠ দলীল : জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ 'যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো সুন্দর নীতি চালু করল এবং পরবর্তীকালে সে অনুসারে আমল করা হলো, তাহলে আমলকারীর প্রতিদানের সমান প্রতিদান তার জন্য লিখিত হবে। এতে তাদের প্রতিদানে কোনো ঘাটতি হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো অশুভ নীতি (বিদআত) চালু করল এবং তার পরে সে অনুযায়ী আমল করা হলো, তাহলে ঐ আমলকারীর খারাপ প্রতিদানের সমান গুনাহ তার জন্য লিখিত হবে'।[১১]

৭ম দলীল : আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا 'যে ব্যক্তি সঠিক পথের দিকে আহ্বান করে, তার জন্য সে পথের অনুসারীদের প্রতিদানের সমান প্রতিদান রয়েছে। এতে তাদের প্রতিদান হতে সামান্য ঘাটতি হবে না। আর যে ব্যক্তি বিভ্রান্তির দিকে আহ্বান করে, তার উপর সে পথের অনুসারীদের পাপের অনুরূপ পাপ বর্তাবে। এতে তাদের পাপরাশি সামান্য হালকা হবে না'।[১২]

(চলবে)

---

৫. ইবনু মাজাহ, 'মুক্বাদ্দামা' 'মানুষকে উত্তম বিষয় শিক্ষাদাতার ছওয়াব' অনুচ্ছেদ, হা/২৪২, আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) ছহীহ সুনানে ইবনু মাজাহ (২/৯৮)-তে হাদীছটিকে হাসান বলেছেন; ইরওয়াউল গালীল, ৬/২৯; মিশকাত, হা/২৫৪।

৬. ইবনু মাজাহ, 'মুক্বাদ্দামা' 'মানুষকে উত্তম বিষয় শিক্ষাদাতার ছওয়াব' অনুচ্ছেদ, হা/২৪০, আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) ছহীহ সুনানে ইবনু মাজাহ (২/৯৭)-তে হাদীছটিকে হাসান বলেছেন।

৭. মুত্তাফাক্ব আলাইহ; ছহীহ বুখারী, 'জিহাদ ও যুদ্ধকালীন আচার-ব্যবহার' অধ্যায়, 'ইসলাম ও নবুঅতের দিকে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আহ্বান আর মানুষ যেন আল্লাহ ব্যতীত তাদের পরস্পরকে রব হিসেবে গ্রহণ না করে' অনুচ্ছেদ, হা/২৯৪২, দেখুন; হা/৩০০৯, ৩৭০১, ৪২১০; ছহীহ মুসলিম, 'ছাহাবায়ে কেরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-এর ফযীলত' অধ্যায়, 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ফযীলত' অনুচ্ছেদ, হা/২৪০৬।

৮. আ'লামুল হাদীছ ফী শরহে ছহীহিল বুখারী, ২/১৪০৮।

৯. কুরতুবী, আল-মাফহূমু লিমা আশকালা মিন তালখীছু কিতাবু মুসলিম, ৬/২৭৬; স্বীয় পিতা, ইকমালু ইকমালুল মুআল্লিম, ৮/২৩১; সানাসী, মুকাম্মালু ইকমালুল ইকমাল, ৮/২৩১।

১০. ছহীহ মুসলিম, 'নেতৃত্ব' অধ্যায়, 'আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদগণকে বাহন ও অন্য কিছু দিয়ে সাহায্য করা এবং তাঁদের পরিবারবর্গের দেখাশুনা করার ফযীলত' অনুচ্ছেদ, ৩/১৫০৬, হা/১৮৯৩; মিশকাত, হা/২০৯, আবূ মাসঊদ আনছারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীছ।

১১. ছহীহ মুসলিম, 'ইলম' অধ্যায়, 'যে ব্যক্তি ইসলামে সুন্দর নীতি অথবা মন্দ নীতি চালু করে এবং যে ব্যক্তি সঠিক পথের দিকে আহ্বান অথবা বিভ্রান্তের দিকে আহ্বান করে' অনুচ্ছেদ, ৪/২০৫৯, হা/১০১৭, জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীছ।

১২. ছহীহ মুসলিম, 'ইলম' অধ্যায়, 'যে ব্যক্তি ইসলামে সুন্দর নীতি অথবা মন্দ নীতি চালু করে এবং যে ব্যক্তি সঠিক পথের দিকে আহ্বান অথবা বিভ্রান্তের দিকে আহ্বান করে' অনুচ্ছেদ, ৪/২০৬০, হা/২৬৭৪।

ঐক্যবদ্ধ থাকুন, মতানৈক্য পরিহার করুন

*[৩০ রবীউল আওয়াল, ১৪৪৩ হি. মোতাবেক ৫ নভেম্বর, ২০২১। মদীনা মুনাওয়ারার আল-মাসজিদুল হারামে (মসজিদে নববী) জুমআর খুৎবা প্রদান করেন **শায়খ আলী ইবনু আব্দুর রহমান আল-হুযায়ফী** হাফিযাহুল্লাহ। উক্ত খুৎবা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন 'আল-ইতিছাম গবেষণা পর্ষদ'-এর সম্মানিত গবেষণা সহকারী **মো. তরিকুল ইসলাম**। খুৎবাটি **'মাসিক আল-ইতিছাম'**-এর সুধী পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হলো।]*

প্রথম খুৎবা

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি মহান ও মর্যাদাবান, যিনি মহত্ত্ব, বড়ত্ব ও সম্মানের অধিকারী। আমি আমার রবের প্রশংসা করছি এবং তাঁর নেয়ামতসমূহের জন্য শুকরিয়া আদায় করছি, যেগুলো তিনি ছাড়া আর কেউ গণনা করতে পারবে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোনো মাবূদ নেই, যিনি অনুগ্রহ ও করুণা করার একমাত্র অধিকারী। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নবী ও নেতা মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দাহ ও রাসূল, যিনি উত্তম চারিত্রিক গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যে বিশেষিত। হে আল্লাহ! ছালাত, সালাম ও বরকত নাযিল করুন আপনার বান্দাহ ও রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর, তাঁর পরিবার-পরিজন ও ছাহাবীদের ওপর, যারা সৎ কাজে প্রতিযোগিতা করতেন।

আল্লাহ তাআলা যা ভালোবাসেন এবং যাতে সন্তুষ্ট হন, সেগুলোর মাধ্যমে এবং তিনি যাতে অসন্তুষ্ট হন সেগুলো পরিত্যাগ করার মাধ্যমে আপনারা তাক্বওয়া অবলম্বন করুন। হে মুসলিম জনতা! তাক্বওয়া জীবনের সকল কিছু সংশোধন করে দেয় এবং মৃত্যুর পরে উচ্চ মর্যাদা লাভ করা যায় একমাত্র তাক্বওয়ার মাধ্যমেই। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জন্য তার কাজকে সহজ করে দেন' *(আত-তালাক, ৬৫/৪)*। আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, 'সেই জান্নাত, আমি যার উত্তরাধিকারী বানাবো আমার বান্দাদের মধ্যে তাদেরকে, যারা মুত্তাক্বী' *(মারইয়াম, ১৯/৬৩)*।

হে মুসলিমগণ! দ্বীন ইসলামকে সংরক্ষণ করার জন্য এই পবিত্র শরীআত ঐক্যবদ্ধ থাকার আদেশ দিয়েছে এবং বিচ্ছিন্নতা ও মতভেদ থেকে নিষেধ করেছে। কারণ এই দ্বীন ব্যতীত জীবন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না এবং এই দ্বীন অনুযায়ী আমল ছাড়া জান্নাত লাভ করাও যাবে না। এই আদেশ দেওয়ার আরো কারণ হলো, যাতে এর মাধ্যমে সমাজ বিচ্ছিন্নতা, অরাজকতা, ঝগড়া-বিবাদ এবং ফাসাদ থেকে রক্ষা পায়। এছাড়াও সংঘর্ষ, শত্রুতা ও একে অপরের উপর বাড়াবাড়ি থেকে রক্ষা পায়। পাশাপাশি বিভিন্ন কল্যাণ এবং সাধারণ ও নির্দিষ্ট হক্বসমূহ সংরক্ষিত হয় আর নিরাপত্তা ও ন্যায়ের বাস্তবায়ন হয়। এসব কারণে আল্লাহ তাআলা ঐক্যবদ্ধ থাকার আদেশ দিয়েছেন এবং মতভেদ থেকে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং বিভক্ত হয়ো না। আর তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহর নেয়ামতকে স্মরণ করো, যখন তোমরা পরস্পরে শত্রু ছিলে। তারপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভালোবাসার সঞ্চার করেছেন। অতঃপর তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেলে। আর তোমরা ছিলে আগুনের গর্তের কিনারায়। অতঃপর তিনি তোমাদের তা থেকে রক্ষা করেছেন। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা হেদায়াতপ্রাপ্ত হও *(আলে ইমরান, ৩/১০)*। আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, 'নেক কাজ ও তাক্বওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না' *(আল-মায়েদা, ৫/২)*। তিনি আরো বলেন, 'আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী একে অপরের বন্ধু' *(আত-তাওবা, ৯/৭১)*। তিনি আরো বলেন, 'মুমিনগণ তো পরস্পর ভাই ভাই' *(আল-হুজুরাত, ৪৯/১০)*। তিনি আরো বলেন, 'তোমরা ছালাত ক্বায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে মযবূতভাবে অবলম্বন করো। তিনিই তোমাদের অভিভাবক, তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক আর কতই না উত্তম সাহায্যকারী!' *(আল-হজ্জ, ২২/৭৮)*। তিনি আরো বলেন, 'আর কেউ আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করলে সে অবশ্যই সরল পথে হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে' *(আলে ইমরান, ৩/১০১)*। আবূ মূসা আল-আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, 'এক মুমিন অন্য মুমিনের জন্য ইমারত তুল্য, যার এক অংশ অন্য অংশকে সুদৃঢ় করে। আর তিনি ﷺ তাঁর এক হাতের আঙুল আর এক হাতের আঙুলে প্রবেশ করিয়ে দেখালেন'।[১] নু'মান ইবনু বাশীর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, 'মুমিনদের উদাহরণ তাদের পারস্পরিক ভালোবাসা, দয়ার্দ্রতা ও সহানুভূতির দিক থেকে

১. ছহীহ বুখারী, হা/২৪৪৬; ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৮৫।

একটি মানবদেহের ন্যায়। যখন তার একটি অঙ্গ আক্রান্ত হয়, তখন তার সমস্ত দেহ ডেকে আনে তাপ ও অনিদ্রা'।[২] আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা সবাই আল্লাহর বান্দা হিসেবে ভাই ভাই হয়ে যাও'।[৩]

ঐক্যবদ্ধ থাকা, পরস্পরকে অনুগ্রহ করা, হক্বকে সাহায্য করা এবং মতভেদ ও বিচ্ছিন্নতাকে পরিহার করা এমন একটি দুর্গ, যেখানে সমাজ আশ্রয় নেয়। এই দুর্গটি হলো সকলের নিরাপদ স্থান, দ্বীনের শক্তি, দুনিয়ার সকল কল্যাণের হেফাযতের মাধ্যম, পথভ্রষ্টকারী সকল ফেতনা থেকে আশ্রয়স্থল এবং শত্রুদের ষড়যন্ত্র ও অনিষ্ট থেকে নিরাপত্তার মাধ্যম। আল্লাহ তাআলা সমাজে ঐক্যবদ্ধ থাকতে, সমাজের শক্তিকে ধরে রাখতে এবং পরস্পর অনুগ্রহ করতে আদেশ করেছেন আর পরস্পর বিচ্ছিন্নতা, শত্রুতা ও মতভেদ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, 'তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ আসার পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে ও নিজেদের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি করেছে। আর তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি' *(আলে ইমরান, ৩/১০৫)*। তিনি আরো বলেন, 'তোমরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করবে না, করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে' *(আল-আনফাল, ৮/৪৬)*। তিনি আরো বলেন, 'আর তোমরা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। যারা নিজেদের দ্বীনকে বিভক্ত করেছে এবং বিভিন্ন দলে পরিণত হয়েছে। প্রত্যেক দলই যা তাদের কাছে আছে তা নিয়ে উৎফুল্ল' *(আর-রূম, ৩০/৩১-৩২)*। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তার উপর অত্যাচার করবে না, তাকে অপদস্থ করবে না, তার বিষয়ে মিথ্যা বলবে না এবং হেয় প্রতিপন্ন করবে না। প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অপর মুসলিমের সম্মান, সম্পদ ও রক্ত হারাম'।[৪] ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তার উপর অত্যাচার করবে না, তাকে শত্রুর হাতে সোপর্দ করবে না'।[৫] এগুলো এমন সকল হক্ব নষ্ট করা থেকে সতর্কবাণী, যেই হক্ব নষ্টের কারণে মুসলিমদের মাঝে বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি হয়।

নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব অছিয়ত করেছেন, সেগুলোতে ঐক্যবদ্ধ থাকার আদেশ রয়েছে। সাথে সাথে বিচ্ছিন্নতা, মতভেদ ও বিদআত থেকেও নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অছিয়তসমূহে দ্বীন ও দুনিয়ার বিষয়সমূহকে একত্রিত করা হয়েছে। নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ছাহাবীদের বলেছিলেন, 'আমি তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করার এবং (রাষ্ট্রনেতার আদেশ) শ্রবণ ও মান্য করার উপদেশ দিচ্ছি, যদিও সে (রাষ্ট্রনেতা) ক্রীতদাস হয়ে থাকে। তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে, তারা বহু মতভেদ প্রত্যক্ষ করবে। তোমাদের মধ্যে কেউ সে যুগ পেলে সে যেন আমার সুন্নাত ও সৎপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে। তোমরা এসব সুন্নাতকে চোয়ালের দাঁতের সাহায্যে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো। তোমরা নতুন নতুন বিষয় আবিষ্কার করা হতে দূরে থাকবে। কেননা তা গোমরাহি'।[৬]

মুসলিমদের ওপর আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহ হলো, তিনি তাদেরকে সব ধরনের ফেতনা থেকে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন, 'আর তোমরা সেই ফেতনা থেকে বেঁচে থাকো, যা বিশেষ করে তোমাদের মধ্যে যারা যালেম শুধু তাদের উপরই আপতিত হবে না। আর জেনে রাখো যে, নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর' *(আল-আনফাল, ৯/২৫)*। এই আয়াতের তাফসীরে মুফাসসিরগণ বলেছেন, তোমরা প্রত্যেক অনিষ্টকর ফেতনার কারণগুলো থেকে বেঁচে থাকো, যেই কারণগুলো তোমাদেরকে আল্লাহর আযাবের সম্মুখীন করে।

পবিত্র **শরীআত আম ফেতনা থেকে নিষেধ করেছেন। সাথে সাথে খাছ বা নির্দিষ্ট ফেতনা** থেকেও নিষেধ করেছেন। কোনো ব্যক্তির জামাআত থেকে বের হওয়াকে শরীআত নিষেধ করেছে। আবূ যার রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি (মুসলিম) জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল, সে ইসলামের রজ্জু তার গর্দান থেকে খুলে ফেলল'।[৭] আবূ যার রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু উছমান রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর মিনাতে চার রাকআত ছালাত আদায় করার বিরোধিতা করেছেন। তারপর তিনি তার সাথে চার রাকআত ছালাতই আদায় করলেন। তাকে বলা হলো, আপনি আমীরুল মুমিনীনের সমালোচনা করলেন। তারপর আপনি নিজেই সেই কাজটি করলেন। তখন তিনি বললেন, মতভেদ করা মন্দ কাজ।[৮]

ইসলাম আরো সতর্ক করেছে দুনিয়ার ফেতনা, আখেরাতের আমলসমূহে অবহেলা করা ও আখেরাতকে ভুলে যাওয়া

২. ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৮৬।
৩. ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৬৩।
৪. ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৬৪।
৫. ছহীহ বুখারী, হা/২৩১০; ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৮০।
৬. তিরমিযী, হা/২৬৭৬।
৭. আবূ দাঊদ, হা/৪৭৫৮।
৮. আবূ দাঊদ, হা/১৯৬০।

থেকে। আখেরাতের জন্য আমল করা, দুনিয়ার বিষয়সমূহকে সংশোধনের জন্য কাজ করা এবং প্রত্যেক কল্যাণকর ও উপকারী কাজসমূহের দ্বারা দুনিয়াকে আবাদ করাই হলো সফলতা, যেটি দ্বীনকে সম্মানিত করে, মুসলিমদের প্রয়োজনকে পূরণ করে, অন্যের কাছে নত হওয়া থেকে বিরত রাখে এবং কল্যাণকর রাস্তায় দান করতে হাতকে প্রসারিত করে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে মানুষ! নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। অতএব, দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে। আর বড় প্রতারক (শয়তান) যেন তোমাদেরকে আল্লাহর ব্যাপারে প্রতারণা না করে' *(ফাত্বির, ৩৫/৫)*। তিনি আরো বলেন, 'প্রতিটি প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর অবশ্যই কিয়ামতের দিনে তাদের প্রতিদান পরিপূর্ণভাবে দেওয়া হবে। সুতরাং যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সে-ই সফলতা পাবে। আর দুনিয়ার জীবন শুধু ধোঁকার সামগ্রী' *(আলে ইমরান, ৩/১৮৫)*।

হালাল ও হারাম বিবেচনা না করে সব জমা করে দুনিয়ার প্রতি আগ্রহী হওয়া সেই জমাকারীর জন্য আযাবস্বরূপ এবং সমাজের জন্য অনিষ্টকর ও অকল্যাণকর। অন্যের ওপর সীমালঙ্ঘন করে এবং তাদের হক্ব ও সম্পদে তাদের ওপর যুলুম করার মাধ্যমে মুসলিমদের মাঝে বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি হয়। এটি মুসলিমদের মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ককে দুর্বল করে। প্রচণ্ড আগ্রহ ও লোভের সাথে দুনিয়া নিয়ে প্রতিযোগিতা করার ফলে মানুষের অন্তরের মধ্যে শত্রুতা, ঘৃণা ও বিরোধ সৃষ্টি হয়। উক্ববা ইবনু আমের (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) উহুদের শহীদদের জন্য (কবরস্থানে) এমনভাবে দু'আ করলেন, যেমন কোনো বিদায় গ্রহণকারী জীবিত ও মৃতদের জন্য দু'আ করেন। তারপর তিনি (ফিরে এসে) মিম্বারে উঠে বললেন, 'আমি তোমাদের জন্য অগ্রগামী এবং আমিই তোমাদের সাক্ষীদাতা। এরপর (কাওছার) হাওযের ধারে তোমাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটবে। আমার এ স্থান থেকেই আমি হাওয দেখতে পাচ্ছি। তোমরা শিরকে জড়িয়ে যাবে আমি এ ভয় করি না। তবে আমার আশঙ্কা হয় যে, তোমরা দুনিয়ার সুখ-শান্তি লাভের জন্য প্রতিযোগিতা করবে'।[৯]

উছমান (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর খেলাফতের সময় কিছু মুনাফিক্বের বের হওয়ার মাধ্যমে এই উম্মতে প্রথম মতভেদের সৃষ্টি হয়েছিল। দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসাই তাদেরকে এই কাজে উদ্বুদ্ধ করেছিল, যেমনটি ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে এবং সেটি প্রমাণিত। পরিতাপ, লাঞ্ছনা ও ঘৃণা ছাড়া তারা আর কোনো কিছু অর্জন করতে পারেনি। আর তারা একে একে অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় ধ্বংস হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর তাদের ও তাদের বাসনার মধ্যে অন্তরাল করা হয়েছে, যেমন আগে করা হয়েছিল এদের সমপন্থীদের ক্ষেত্রে' *(সাবা, ৩৪/৫৪)*।

নবুঅতের অনেক পরের বর্তমান এই যুগটিতে দুনিয়া অনেকের জন্য ফেতনায় পরিণত হয়েছে। দুনিয়ার কোনো স্বার্থে পরস্পর বন্ধুত্ব রাখা, পরস্পর ঘৃণা ও শত্রুতা করা এবং দুনিয়ার কারণেই সম্মান করা- এগুলোর কারণে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের আবেগ প্রবণতার সৃষ্টি হয়েছে। একমাত্র **আল্লাহর জন্যই ভালোবাসা ও শত্রুতা করার পরিমাণ অনেক কমে গিয়েছে। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) বলেছেন, এখন মানুষের অধিকাংশ বন্ধুত্ব পরিণত** হয়েছে দুনিয়ার বিষয়কে কেন্দ্র করে। আর এটি তাদের কোনোই উপকারে আসবে না।

দুনিয়ার ফেতনা থেকে বাঁচার উপায় হলো, যিনি দুনিয়া সম্পর্কে সবেচেয়ে বেশি জানেন, সেই আল্লাহ তাআলার নিকটে দুনিয়ার মূল্যটা জানা। সাহল ইবনু সা'দ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যদি দুনিয়ার মূল্য আল্লাহ তাআলার কাছে মশার ডানার পরিমাণও হতো, তাহলে তিনি কাফেরকে এক ঢোক পানিও পান করতে দিতেন না'।[১০]

পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ থেকে বাঁচার উপায় হলো যুহদ বা দুনিয়াবিমুখতা। নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তুমি দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি অবলম্বন করো, তাহলে আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন। আর মানুষের নিকট যা আছে, তুমি তার প্রতি অনাসক্ত হয়ে যাও, তাহলে তারাও তোমাকে ভালোবাসবে'।[১১] যুহদ হলো হারাম পরিত্যাগ করা, আল্লাহ আপনাকে যা দিয়েছেন তাতেই পরিতৃপ্ত থাকা, আখেরাতের জন্য কাজ করা, দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে না পড়া, মানুষের কাছে যা আছে, সেটির প্রতি কামনা বাসনা না করা এবং আল্লাহ তাআলা কাউকে কিছু দিলে সেই মানুষের প্রতি হিংসা না করা।

আল্লাহ তাআলা আমাকে ও আপনাদেরকে কুরআনের বরকত দান করুন এবং এতে যে আয়াত ও হিকমতপূর্ণ উপদেশ আছে, সেগুলো দিয়ে যেন তিনি আমাদের উপকার করেন। আমি আল্লাহ তাআলার কাছে ইস্তেগফার করছি। আপনারাও একমাত্র তারই কাছে ইস্তেগফার করুন। নিশ্চয় তিনি মহাক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

---

৯. ছহীহ বুখারী, হা/৩৭১৬; ছহীহ মুসলিম, হা/২২৯৬।

১০. তিরমিযী, হা/২৩২০।

১১. ইবনু মাজাহ, হা/৪১০২।

দ্বিতীয় খুৎবা

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি সর্বজয়ী, হিকমতওয়ালা, ধৈর্যশীল ও পরম দয়ালু। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি ছাড়া সত্যিকার কোনো মাবূদ নেই আর আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল।

অতঃপর গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহ তাআলার তাক্বওয়া অবলম্বন করুন। কেননা তাক্বওয়াই হলো বর্তমানে বিদ্যমান নেয়ামতসমূহ সংরক্ষণের মাধ্যম আর ভবিষ্যতে আসা নেয়ামতসমূহের নিশ্চয়তাদানকারী। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন করো এবং সঠিক কথা বলো। তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে’ *(আল-আহযাব, ৩৩/৭০-৭১)*।

হে মুসলিমগণ! নিশ্চয় ইসলাম মানুষকে জবানের ত্রুটি সম্পর্কে সতর্ক করেছে। কেননা কথা অথবা লেখনীর দ্বারা ঐক্য ছিন্নভিন্ন হয়, মতভেদের রাস্তা প্রশস্ত হয়। তাই নবী ﷺ বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাত দিবসে ঈমান আনে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে’।[১২] নবী ﷺ এসব ফেতনা থেকে একাধিকবার স্পষ্টভাবে সতর্ক করেছেন। বাতিল কথা বলাতেই ধ্বংস বিদ্যমান বলে তিনি সতর্ক করেছেন। নবী ﷺ বলেছেন, ‘জিহ্বার ব্যবহার তখন (ফেতনার সময়) তরবারির আঘাতের চেয়েও মারাত্মক হবে’।[১৩]

হে আল্লাহর বান্দাগণ! গোপনে ও প্রকাশ্যে ইবাদত করে ও হারাম থেকে দূরে থেকে আল্লাহর নিকটবর্তী হয়ে নিরাপত্তা

হারাম থেকে দূরে থেকে আল্লাহর নিকটবর্তী হয়ে নিরাপত্তা

ও সচ্ছলতাকে স্থায়ী রাখুন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘অতএব, তারা ইবাদত করুক এ ঘরের রবের। যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় খাদ্য দিয়েছেন এবং ভীতি থেকে তাদেরকে নিরাপদ করেছে’ *(কুরাইশ, ১০৫/৩-৪)*।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দু‘আ-ইস্তেগফার করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর ছালাত পাঠ করো এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও’ *(আল-আহযাব, ৩৩/৫৬)*। নবী ﷺ বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আমার ওপর এক বার ছালাত পাঠ করে, আল্লাহ তাআলা তার ওপর দশ বার রহমত নাযিল করেন। হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর এবং তার পরিবার-পরিজনের ওপর রহমত নাযিল করুন, যেমনভাবে আপনি ইবরাহীমের ওপর এবং তার পরিবার-পরিজনের ওপর রহমত নাযিল করেছিলেন। হে আল্লাহ! আপনি খুলাফায়ে রাশেদীন আবূ বকর, উমার, উছমান ও আলীসহ সকল ছাহাবীর ওপরে এবং তাদেরকে যারা ইহসানের সাথে অনুসরণ করে, তাদের ওপরও সন্তুষ্ট হয়ে যান। আর হে শ্রেষ্ঠ দয়ালু! আপনি আমাদেরকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

‘হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ তাআলাকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করো এবং সকাল-সন্ধ্যায় তার পবিত্রতা বর্ণনা করো’ *(আল-আহযাব, ৩৩/৪১-৪২)*। মহান আল্লাহকে স্মরণ করুন, তাহলে তিনি আপনাদেরকে স্মরণ করবেন। আর তার নেয়ামতসমূহের শুকরিয়া আদায় করুন, তাহলে তিনি আরো বাড়িয়ে দিবেন। আল্লাহর যিকিরই বড়। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ তা জানেন।

১২. ছহীহ বুখারী, হা/৬০১৯।
১৩. আবূ দাঊদ, হা/৪২৬৫।

হাফ ভাড়া শিক্ষার্থীদের আবদার, না-কি অধিকার?

*-জুয়েল রানা**

গণপরিবহণে শিক্ষার্থীদের জন্য ‘হাফ পাস’ বা অর্ধেক ভাড়া নির্ধারণের দাবিতে আন্দোলনে নেমেছে রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। ঢাকার রাজপথ আবারও কোমলমতি শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে উত্তাল। বিষয়টি নিয়ে শিক্ষার্থী ও পরিবহণ শ্রমিকদের মধ্যে অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটেছে।

তেলের মূল্যবৃদ্ধির কারণে বাসের ভাড়া বাড়ানো হয়। বর্ধিত ভাড়ার মধ্যে কিছুদিন ধরে শিক্ষার্থীরা তাদের জন্য অর্ধেক ভাড়া চালুর দাবি জানাচ্ছে। তারা রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ মোড় ও সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছে। গত শনিবার (৪ ডিসেম্বর, ২১) দুপুর ১২টা ১৫ মিনিটে খিলগাঁও মডেল কলেজের ২০-৩০ জন শিক্ষার্থী রামপুরা ব্রিজের হাতিরঝিল থানা অংশে নিরাপদ সড়ক দাবি, সড়কে অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে লাল কার্ড নিয়ে রাস্তায় নেমেছিলেন।

হাফ বা অর্ধেক ভাড়া নিয়ে তর্কাতর্কির জেরে ঢাকার বদরুন্নেসা মহিলা কলেজের শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের হুমকি দেওয়ার অভিযোগে একটি বাসের চালকের সহকারী (হেলপার) ও চালককে আটক করেছে র‍্যাব। এর আগে অভিযুক্ত হেলপার-চালকের গ্রেফতার ও ‘হাফ পাস’ নির্ধারণের দাবিতে ওই কলেজের শিক্ষার্থীরা সড়ক অবরোধ করে সরকারকে ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দেয়।

রাজধানীর আফতাবনগরে অবস্থিত ইম্পেরিয়াল কলেজের এক শিক্ষার্থী ‘রাইদা পরিবহণ’-এর একটি বাসে ‘হাফ ভাড়া’ দিতে চাইলে কথা কাটাকাটি ও তর্কাতর্কি হয়। এক পর্যায়ে ওই শিক্ষার্থীকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বাস থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়। ওই ঘটনার জের ধরে রামপুরা ব্রিজে অবস্থান নেয় কলেজটির শিক্ষার্থীরা। তারা রাইদা পরিবহণের অন্তত ৫০টি বাস আটকে দেয়। ফলে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে বাধ্য হয় রাইদা কর্তৃপক্ষ। থানায় বসে চলা ওই আলোচনায় মালিকপক্ষ কথা দেয় ইম্পেরিয়াল কলেজের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে হাফ ভাড়া নেওয়া হবে। পরবর্তীকালে মহাখালীর তিতুমীর কলেজের শিক্ষার্থীরা হাফ পাসের দাবিতে মাঠে নামে। তারা রাইদা পরিবহণের প্রতিটি বাসের গায়ে ‘হাফ পাস আছে’ কথাটি লিখে দেয়। প্রসঙ্গত, রাজধানীতে চলাচলকারী অনেক পরিবহণ সার্ভিসের বাসে লেখা দেখা যায়— ‘হাফ পাস নাই’। তিতুমীর কলেজের শিক্ষার্থীরা বিষয়টাকে উলটে দেয়। প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক— হাফ পাস বা অর্ধেক ভাড়া দেওয়া শিক্ষার্থীদের আবদার, না-কি অধিকার?

বছরের পর বছর ধরে আমাদের দেশে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অর্ধেক ভাড়া নেওয়ার এই রীতি চলে এসেছে। শিক্ষার্থীদের নিজস্ব আয় থাকে না। তারা অভিভাবকদের দেওয়া হাত খরচের ওপর নির্ভরশীল। হাফ ভাড়া দিয়ে যাতায়াত করতে পারলে তাদের শিক্ষার খরচ কিছুটা হলেও কমে, চাপ কমে অভিভাবকদের। হ্যাঁ, শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে গণপরিবহণে অর্ধেক ভাড়া নেওয়া রীতি বটে, আইন নয়। যদিও হাফ পাসের বিষয়টিকে অধিকার হিসেবে দেখে আসছে শিক্ষার্থীরা। আমাদের দেশের মতো উন্নয়নশীল দেশেই নয়; অনেক দেশেই এ ব্যবস্থা আছে বলে ঢাকার একটি গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন ‘নিরাপদ সড়ক চাই’ (নিসচা)-এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ইলিয়াস কাঞ্চন।

বাংলাপিডিয়ার তথ্য অনুসারে, ১৯৬৯ সালের জানুয়ারিতে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের হাত ধরে আসা ১১ দফা দাবির একটি ছিল ‘হাফ ভাড়া’ নির্ধারণ। পশ্চিম পাকিস্তানি স্বৈরাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের ঘোষিত এই ১১ দফা দাবির একটি ছিল শিক্ষার্থীদের জন্য অর্ধেক ভাড়া রাখা। দাবির ১ (ঢ) দফা অনুসারে, ‘ট্রেনে, স্টিমারে ও লঞ্চে ছাত্রদের “আইডেন্টিটি কার্ড” দেখাইয়া শতকরা পঞ্চাশ ভাগ “কন্সেসনে” (ছাড়ে) টিকিট দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। মাসিক টিকিটেও “কন্সেসন” দিতে হইবে।’

বাস্তবতা হলো— স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীরা অনেকটা রীতি হিসেবে এতদিন গণপরিবহণে অর্ধেক ভাড়া দিয়ে আসলেও কোনো কোনো পরিবহণ কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের এই অধিকারের প্রতি অবজ্ঞা করে আসছিল। বিশেষ করে ঢাকা শহরের তথাকথিত ‘সিটিং সার্ভিস’ তকমা লাগানো অধিকাংশ বাস শিক্ষার্থীদের দাবির প্রতি তোয়াক্কা করছিল না। উলটো হাফ ভাড়ার দাবি তোলা শিক্ষার্থীদের তারা হয়রানি করছিল। এ নিয়ে অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাও ঘটেছে।

দুঃখজনক হলেও সত্য, সর্বশেষ সবচেয়ে বড় ছাত্র আন্দোলন; ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দের নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের অন্যতম দাবি মানা হয়নি। শিক্ষার্থীদের কঠিন আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে নিরাপদ সড়ক আইন পাস হয়, উপেক্ষিত থাকে হাফ পাসের বিষয়টি।

আমাদের দেশে শিক্ষার্থীদের বড় একটা অংশ নিম্নবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। এ ধরনের পরিবার

* খত্বীব, গছাহার বেগ পাড়া জামে মসজিদ (১২ নং আলোকডিহি ইউনিয়ন), গছাহার, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর; সহকারী শিক্ষক, চম্পাতলী জান্দিপাড়া ইসলামিক একাডেমি, চম্পাতলী বাজার, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

থেকে আসা শিক্ষার্থীদের জন্য হাফ ভাড়ার ব্যবস্থা থাকা জরুরী। এ ব্যাপারে সরকারকে নীতিমালা তৈরিসহ আইন প্রণয়ন করতে হবে। শুধু আইন তৈরি নয়; তা বাস্তবায়নে কঠোর নযরদারিও প্রয়োজন। শিক্ষার্থীরা নির্বিঘ্নে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাতায়াতসহ শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ পেলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হবে যোগ্য ও দক্ষ। দ্রব্যমূল্যেও ঊর্ধ্বগতির এই সময়ে যাতায়াতের ভাড়ার কারণে গরীব কোনো শিক্ষার্থীর পড়াশোনা বন্ধ হলে এটা হবে আমাদের সবার লজ্জার কারণ।

এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করা উচিত। সেটা হলো পরিবহণ শ্রমিকদের স্বার্থ। দেশের পিছিয়ে পড়া নিম্ন আয়ের একটা অংশ পরিবহণ সেক্টরে শ্রম দেন। 'হাফ পাস' বাস্তবায়ন করতে গিয়ে যেন তাদের পেটে লাথি না পড়ে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ বাস মালিকদের কাছ থেকে দৈনিক চুক্তিতে বাস এনে রাজধানীতে বাস চালান ড্রাইভার-কনট্রাকটর-হেলপাররা। জমার টাকা উঠিয়ে তারপর যা আয় হয় সেটা ভাগ হয় এই তিন জনের মধ্যে। এতে কোনো বাসে অতিরিক্ত শিক্ষার্থী উঠলে তা বাস শ্রমিকদের রুটি-রুযীতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। তাই 'হাফ পাস'-এর নীতিমালা বা আইনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে শিক্ষার্থীরা কেবল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বা শিক্ষাসংশ্লিষ্ট কাজে যাতায়াতকালে বৈধ পরিচয়পত্র প্রদর্শন সাপেক্ষে অর্ধেক ভাড়া দেবে। এছাড়া দৈনিক হাযিরা অথবা মাসিক বেতনের ভিত্তিতে বাসের চালক-হেলপার নিয়োগে বাস মালিকদের বাধ্য করার বিধান রাখা যেতে পারে। এতে চালক-কন্ট্রাকটর-হেলপাররা 'যে কোনো মূল্যে' বাড়তি ভাড়া আদায়ে মরিয়া হবে না।

উল্লেখ্য, রাজধানীর রামপুরা এলাকায় গ্রিন অনাবিল পরিবহণের বাসের চাপায় শিক্ষার্থী মইনুদ্দিন নিহত হন। এ ঘটনায় রাতে সড়ক অবরোধ করে উত্তেজিত জনতা। এ সময় ঘাতক বাসসহ আটটি বাসে আগুন দেওয়া হয়। ভাঙচুর করা হয় আরো চারটি বাস।

শিক্ষার্থীদের কাছে এভাবে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ কাম্য নয়। বিচার নিজের হাতে তুলে না নিয়ে প্রশাসন ও বিচার বিভাগের উপরই ছেড়ে দিতে হবে। আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে বা ক্যাম্পাসে দেখতে চাই, রাজপথে নয়। করোনা মহামারির দীর্ঘ বন্ধের পর তাদের শ্রেণিকক্ষে থাকা খুব জরুরী। পড়াশোনার এমনিতেই অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। আর ক্ষতি কাম্য নয়।

হাফ পাসের দাবির বিষয়টি নতুন কোনো বিষয় নয়, পুরনো বচসা নতুন রূপে ফিরে এসেছে। ইতিহাস বলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভেরও আগে, পাকিস্তান আমলে এ দেশে শিক্ষার্থীরা যানবাহনে হাফ ভাড়া দেওয়ার অধিকার পেয়ে এসেছে। কিন্তু বিগত কয়েক বছর ধরে বিষয়টি নিয়ে গণপরিবহণ; বিশেষত ঢাকা শহরের কোনো কোনো পরিবহণ কোম্পানির তথাকথিত সিটিং সার্ভিসগুলোতে হাফ ভাড়া না রাখার প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। এ নিয়ে নানা সময়ে ঘটেছে অপ্রীতিকর ঘটনা। যার পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দে শিক্ষার্থীদের 'নিরাপদ সড়ক আন্দোলন'-এর ৯ দফা দাবির মধ্যেও হাফ ভাড়ার বিষয়টি ছিল। 'হাফ পাস' নির্ধারণ দেশের সকল শিক্ষার্থীরই চাওয়া বলে আমরা মনে করি।

বিদ্যমান পরিস্থিতি ২০১৮ সালের নিরাপদ সড়ক আন্দোলনকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। সেই বছর ২৯ জুলাই রাজধানীর বিমানবন্দর সড়কে দ্রুতগতির দুই বাসের সংঘর্ষে রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট কলেজের দুই শিক্ষার্থী মর্মান্তিকভাবে নিহত হলে স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষাঙ্গন ছেড়ে নেমে আসে রাজপথে। সেই দুই কলেজশিক্ষার্থীর সহপাঠীদের মাধ্যমে শুরু হওয়া সেই বিক্ষোভ পরবর্তীকালে ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে। ৯ দফা দাবিতে তারা সোচ্চার ও প্রতিবাদী হয়ে উঠে। এবারও তাদের দাবি ৯ দফা। এবার জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধিতে ২৭ শতাংশ পরিবহণ ভাড়া বাড়ানো হলে প্রথমে শিক্ষার্থীরা হাফ ভাড়ার দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করে। একপর্যায়ে সিটি কর্পোরেশনের ময়লার গাড়ি নটর ডেম কলেজের শিক্ষার্থী নাঈম হাসানকে চাপা দিলে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে লাভ করে নতুন মাত্রা এবং এখন নিরাপদ সড়ক আন্দোলনই মুখ্য হয়ে উঠেছে। রামপুরায় স্কুলছাত্র মইনুদ্দিন ইসলাম দুর্জয় বাসের চাকায় পিষ্ট হওয়ার পর এই আন্দোলন ক্রমেই বেগবান হচ্ছে বলে প্রতীয়মান।

বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনায় আর কত মায়ের বুক খালি হবে? আমাদের সড়ক ও পরিবহণব্যবস্থা কেন এত বিশৃঙ্খল ও দুর্ঘটনাপ্রবণ? দুর্জয়কে হাসপাতালে নেওয়ার পর তার মা রাস্তায় বসে পড়েন ছেলে ফিরে আসবে বলে। কিন্তু তার ছেলে জীবিত নয়; লাশ হয়ে ফিরে এসেছে। বাংলাদেশে সড়ক নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করা সংস্থাগুলো বলছে, প্রতি বছর সড়ক দুর্ঘটনায় যত মানুষ মারা যায়, তার উল্লেখযোগ্য অংশ শিক্ষার্থী ও শিশু।

এই শিক্ষার্থী ও শিশুদের ব্যাপারে আমরা কেন এত উদাসীন? আমরা কীভাবে তাদের বাস হতে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে পারি? আমরা কীভাবে এতটা পাষণ্ড ও নির্মম হতে পারি?

প্রজেক্টর নিয়ে কিছু কথা

-সাঈদুর রহমান*

—কী চাচা, চেহারা এমন বিদঘুটে হয়ে আছে কেন? যেন আলকাতরা লেপটে দেওয়া হয়েছে আপনার চেহারায়! চিন্তা ও বিষণ্নতার ছাপ পরিস্ফুটিত হচ্ছে। আপনার চেহারার চিরচেনা সজীবতা ম্লান হয়ে গেল কেন? হাস্যোজ্জ্বলভাব কোথায় হারিয়ে গেল? বুঝতে পেরেছি, চাচির সাথে ঝগড়া হয়েছে। ঝগড়া তো হবার কথাই; কারণ তারুণ্যের বাসন্তী হাওয়া আপনার থেকে বিদায় নিয়ে পৌষি হাওয়া বইতে শুরু করেছে! এখন আর চাচির আপনাকে ভালো লাগে না। কথা বলছেন না কেন, অসুখ-বিসুখ হলো নাকি?

—তোমার মশকরা ও সাহিত্যিক ভাষা ঢাকায় গিয়ে বলো, আমাদের মতো মূর্খ মানুষের সাথে বলে লাভ নেই। যত প্যাঁচ হলো হুজুরদের মাঝে। এজন্যই লোকমুখে কিংবদন্তি হয়ে আছে, 'দু'হুজুর এক লেপের নিচে ঘুমোতে পারে না'।

—কী হয়েছে চাচা, একটু খুলে বলুন তো?

—গতকাল এক হুজুর থেকে শুনলাম, মহিলারা প্রজেক্টরের মাধ্যমে বক্তার চেহারা দেখে ওয়ায-নছীহত শুনতে পারবে; এটা তাদের জন্য বৈধ আছে। আজ আরেক বক্তা থেকে শুনলাম, চেহারা দেখা না-কি যাবে না; দেখা না-কি অবৈধ। আমরা সাধারণ মানুষ কোন পথে চলব? মাঝে মাঝে মনে চাই ভিন্ন গ্রহে বসবাস করি!

—এতক্ষণে বুঝতে পারলাম আপনার মনোক্ষুণ্ন হওয়ার কারণ কী। চাচা আপনার হাতে কি সময় আছে? মানে আমি বলতে চাচ্ছি এই বিষয়টি আপনার কাছে সুস্পষ্ট করব।

—তোমার কথা আর কী শুনব, পুঁচকে বাচ্চা তুমি!

—তারপরও একটু চেষ্টা করতাম আপনি বললে।

—ঠিক আছে বলো, আমি এখন একটু ফ্রি আছি। শুনি, কী তোমার জাদুমাখা কথা।

—বিরক্ত হবেন না কিন্তু, একদম বসে বসে শুনবেন।

—আচ্ছা, বলো না!

—পৃথিবীর বুকে যা কিছু আছে সব আল্লাহ তাআলা মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। বর্তমানে যা কিছু আবিষ্কৃত হচ্ছে বা হবে, সবকিছুই আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি। তিনি বলেন, ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ 'আল্লাহ তোমাদের ও তোমরা যা কিছু কর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন' *(আছ-ছাফফাত, ৩৭/৯৬)*। আল্লাহ আরও বলেন, ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ 'তোমাদের অজানা আরো অনেক কিছু তিনি সৃষ্টি করবেন' *(আন-নাহল, ১৬/৮)*। মানুষের একটি স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য হলো, 'কৌতূহল প্রবণতা', অজানা বিষয় জানার সর্বাত্মক চেষ্টা করা। এই প্রবণতা অতীতেও ছিল, বর্তমানেও আছে ও ভবিষ্যতেও থাকবে। আধুনিক যুগে একটি যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে, এর নাম হলো 'প্রজেক্টর'। কিন্তু সমস্যা হলো এই 'প্রজেক্টর' নিয়ে বিদ্বানদের মাঝে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হচ্ছে। কিছু বিদ্বান বলেছেন, প্রজেক্টরের মাধ্যমে মহিলারা বক্তার চেহারা দেখে ওয়ায-নছীহত শুনতে পারবে। আর কিছু বিদ্বান বলেছেন, পারবে না। চাচা! আপনার কাছে দু'দলের দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করে সঠিক মত জানানোর চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। যারা বলেছেন, প্রজেক্টরের মাধ্যমে মহিলারা বক্তার চেহারা দেখে ওয়ায-নছীহত শুনতে পারবে না, তাদের দলীল— আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ '(হে নবী) মুমিন নারীদেরকে বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে ও লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ করে' *(আন-নূর, ২৪/৩১)*। এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা নারীদের চক্ষু অবনত রাখতে আদেশ করেছেন। অতএব, নারীরা পর পুরুষের চেহারা দেখতে পারবে না, চাই তা প্রত্যক্ষভাবে হোক বা প্রজেক্টরের মাধ্যমে।

عَنْ نَبْهَانَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَيْمُونَةُ قَالَتْ فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ أَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ احْتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى لاَ يُبْصِرُنَا وَلاَ يَعْرِفُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

উম্মু সালামা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) ও মায়মূনা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, আমরা দু'জন তাঁর নিকটে অবস্থানরত থাকতেই ইবনু উম্মে মাকতূম (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) তাঁর নিকট এলেন। এটা পর্দার নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার পরের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'তোমরা উভয়ে তার থেকে পর্দা করো'। আমি (উম্মু সালামা) বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি তো অন্ধ মানুষ, তিনি তো আমাদের দেখতেও পারছেন না, চিনতেও পারছেন না! রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, তোমরাও কি অন্ধ? তোমরাও কি তাকে দেখতে পাচ্ছ না?[১] এই হাদীছে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বীয় স্ত্রীদ্বয়কে অন্ধ ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-কে দেখতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, মহিলারা পুরুষদের দেখতে পারবে না। চাচা! জেনে রাখুন একটি কথা, এই হাদীছটি কিন্তু দুর্বল!

—তাই না-কি?

* শিক্ষক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বীরহাটাব-হাটাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. তিরমিযী, হা/২৭৭৮, হাদীছ দুর্বল।

—হ্যাঁ। মুহাদ্দিছদের একটি বড় দল এই হাদীছকে দুর্বল বলেছেন।

—ঠিক আছে, তারপর বলতে থাকো।

—এখন উল্লেখ করব ওই সমস্ত বিদ্বানদের দলীল, যারা বলে প্রজেক্টরের মাধ্যমে মহিলারা বক্তার চেহারা দেখে ওয়ায-নছীহত শুনতে পারবে।

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ فَتَسَخَّطَتْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَىْءٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهَا لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ وَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لاَ مَالَ لَهُ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ قَالَتْ فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ . فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَاغْتَبَطْتُ بِهِ .

ফাতেমা বিনতে ক্বায়েস রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত, আবূ আমর ইবনু হাফছ রাযিয়াল্লা-হু আনহু অনুপস্থিত থাকা অবস্থাতেই তাকে চূড়ান্ত তালাক দেন। তিনি তার প্রতিনিধির মাধ্যমে তার নিকট সামান্য কিছু যব (খোরাকি) পাঠালেন। এতে ফাতেমা রাযিয়াল্লা-হু আনহা রাগান্বিত হলেন। প্রতিনিধি লোকটি বলল, আল্লাহর শপথ! আপনার জন্য আমাদের উপর কোনো পাওনা নেই। অতঃপর ফাতেমা রাযিয়াল্লা-হু আনহা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত

হয়ে তাঁকে বিষয়টি জানালেন। তিনি বললেন, 'তার থেকে তুমি খোরাকি পাওয়ার অধিকারিণী নও। তিনি তাকে উম্মু শারীকের ঘরে ইদ্দত পালনের নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি বললেন, তার ঘরে তো আমার ছাহাবীদের আসা-যাওয়ার একটা ভিড় থাকে। তুমি বরং ইবনু উম্মে মাকতূমের ঘরে অবস্থান করো। কারণ সে অন্ধ মানুষ। তোমার পোশাক বদলাতে কোনোরূপ অসুবিধা হবে না। তোমার ইদ্দাতকাল শেষ হলে আমাকে জানাবে'। ফাতেমা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, আমার ইদ্দতকাল শেষ হলে আমি তাঁকে জানালাম, মুআবিয়া ইবনু আবূ সুফিয়ান ও আবূ জাহম উভয়ে আমার নিকট বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এই যে আবূ জাহম, তার কাঁধ থেকে লাঠি কখনো নিচে নামায় না (অর্থাৎ সে স্ত্রীকে মারধর করে) আর মুআবিয়া! তার তো কোনো সম্পদই নেই। তুমি বরং উসামা ইবনু যায়েদকে বিয়ে করো'। ফাতেমা বলেন, প্রথমে আমি তাঁর এ প্রস্তাবকে অপছন্দ করি। কিন্তু তিনি পুনরায় বললেন, 'তুমি উসামা ইবনু যায়েদকে বিয়ে করো'। সুতরাং আমি তাকে বিয়ে করলাম। মহান আল্লাহ আমাদের এ দাম্পত্য জীবনের মধ্যে যে বরকত দান করেছেন, তাতে আমি অন্যের ঈর্ষার পাত্র হয়েছি।[২] এ হাদীছের মাঝে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা বিনতে ক্বায়েস রাযিয়াল্লা-হু আনহা-কে অন্ধ ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর গৃহে ইদ্দত পালন করতে বলেছেন। এমনিভাবে তিনি একথাও বলেছেন যে, তুমি কাপড় বদলাতে গেলেও সে তোমাকে দেখতে পাবে না। এখান থেকে এ বিষয়টি সহজেই অনুমেয় যে, ফাতেমা বিনতে ক্বায়েস রাযিয়াল্লা-হু আনহা অন্ধ ছাহাবীকে বিভিন্ন সময় দেখতেন।

أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمًا عَلَى باب حُجْرَتِي وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ، أَنْظُرُ إِلَى لَعِبِهِمْ.

আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, একদা আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আমার ঘরের দরজায় দেখলাম। তখন হাবশার লোকেরা মসজিদে (বর্শা দ্বারা) খেলা করছিল। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাদর দিয়ে আমাকে আড়াল করে রাখছিলেন। আমি ওদের খেলা অবলোকন করছিলাম।[৩] এই হাদীছ একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ মহিলারা পুরুষদের দেখার ব্যাপারে। এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা। আর ওই সময় তিনি ১৬ বছরের পূর্ণ যুবতী ছিলেন। এ হাদীছের উপর ভিত্তি করে মোল্লা আলী কারী হানাফী ও জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাহিমাহুমাল্লা বলেন, 'মহিলারা কামভাব ব্যতিরেকে পুরুষদের দেখতে পারবে'।[৪] হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী রাহিমাহুল্লা-হ ফাতহুল বারীতে বলেন, 'কামভাব ব্যতিরেকে মহিলারা অপরিচিত পুরুষের দিকে তাকাতে পারবে'।[৫] রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে মহিলারা মসজিদে ছালাত আদায় করতে যেত। আর এ কথা সহজেই অনুমেয় যে তারা পুরুষদের দেখতে পেত। এমনিভাবে মহিলাদের মুখাবয়ব ঢেকে রাখতে আদেশ

২. আবূ দাঊদ, হা/২২৮৪, হাদীছ ছহীহ।
৩. ছহীহ বুখারী, হা/৪৫৪।
৪. মিরকাত, ৬/২৬০।
৫. ফাতহুল বারী, ৪/৫১, হা/১২৯৯।

করা হয়েছে; কিন্তু পুরুষদের তো আদেশ করা হয়নি। এখান থেকেও বুঝা যাচ্ছে, মহিলারা পুরুষদের চেহারা দেখতে পারবে আর পুরুষরা মহিলাদের চেহারা দেখতে পারবে না। কারণ পুরুষরা তো সাধারণত খোলামেলা চলাফেরা করে। তবে তারা বলেছেন, কোনো মহিলা যদি কামভাব নিয়ে বক্তার আলোচনা শুনে, তাহলে ওই মহিলার জন্য বক্তার চেহারা দেখা বৈধ নয়। এই মহিলার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত আয়াত প্রযোজ্য হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ ‘(হে নবী) মুমিন নারীদেরকে বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে ও লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ করে’ *(আন-নূর, ২৪/৩১)*।

—চাচা, এই দুটি মতের মাঝে দ্বিতীয় মতটিই আমি মনে করি গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ কামভাব ব্যতিরেকে মহিলারা বক্তার চেহারা দেখে প্রজেক্টরের মাধ্যমে ওয়ায-নছীহত শুনতে পারবে।

—ভাতিজা, তোমার কথাগুলো খুব ভালো লাগল। সব হুজুর শুধু এক পক্ষের প্রমাণ উপস্থাপন করে। তুমি উভয় পক্ষের প্রমাণ উপস্থাপন করে সুন্দর একটি ফয়সালা দিয়েছো। আল্লাহ তোমার জ্ঞানে সমৃদ্ধি দান করুন, জাতির কল্যাণে তোমাকে কবুল করুন। বর্তমান সমাজে মানুষ দিশেহারা হয়ে পাপ কাজের পেছনে ছুটছে। মূর্খতার বশবর্তী হয়ে হাজারো অন্যায় কাজে জড়িয়ে পড়ছে। তুমি এই পথভোলা জাতিকে সঠিক দিশা দিবে। তাদের অন্তরে জ্ঞানের ফল্গুধারা বইয়ে দিবে। দৃঢ়তার সাথে বিদআতীদের মুখোশ উন্মোচন করবে। আল্লাহ তোমার সহায় হোন— আমীন!

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত ছহীহ আকীদার হাফেজ দ্বারা
ঢাকা হতে পরিচালিত
মারকাজুত তাহফিজ ইন্টারন্যাশনাল মাদরাসা
আবাসিক/অনাবাসিক
রাজশাহী শাখায়
ভর্তি চলছে
বিভাগসমূহ
◇ হিফজুল কুরআন বিভাগ
◇ নূরানী বিভাগ
◇ শুনানী ও প্রতিযোগী বিভাগ
বি.দ্র. একই সাথে বাংলা, ইংরেজীসহ জেনারেল শিক্ষার সু-ব্যবস্থা।
৫ম ও ৮ম বার্ষিক পরীক্ষা দেওয়ার ব্যাবস্থা (মাদরাসা বোর্ড থেকে)।
সম্মানিত অভিভাবক,
নিঃসন্দেহে এটি একটি বিশ্বমানের হিফজ প্রতিষ্ঠান। অতএব আপনার সন্তানকে পরিপূর্ণ হাফেজে কোরআন হিসাবে গড়ে তোলা আমাদের দায়িত্ব। গড়ে তুলবই আমরা ইনশা-আল্লাহ।
ভর্তি ও মাসিক চার্জ
○ সেশন চার্জসহ ভর্তি ফি - ৭,১০০/=
মাসিক প্রদেয় (ভিআইপি) খরচ - ৫,০০০/=
মাসিক প্রদেয় (স্পেশাল) খরচ - ৪,০০০/=
○ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় খরচ অনেক কম হওয়া সত্ত্বেও হালকা নাস্তাসহ দিনে ৪ বার উন্নত মানের খাবার পরিবেশন করা হয়।
প্রিন্সিপাল ও পরিচালক
অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত ক্বারী, একাধিক টেলিভিশন প্রোগ্রামার ও ইসলামী আলোচক
শায়খ হাফেজ ক্বারী মাওলানা ইব্রাহীম মোল্লা।
বিস্তারিত জানতে কল করুন
০১৭১৭-৪৯৬৪১০
ঠিকানা : ক্যান্টনমেন্টের উত্তরে, ডাবতলা মোড়, রাজপাড়া, রাজশাহী।

ফিরিয়ে নাও!

-আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রাযযাক
ফারেগ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ,
বানারাস, ভারত।

প্রভু ফিরিয়ে নাও মোরে তব গৃহে,
শূন্যতা আজ বিজন হৃদয় মাঝে।
বিরহ বিধুর হিয়ায় কষ্ট ঝংকারে,
তব গৃহপানে দৃষ্টি মোর যায় বারেবারে।
অশান্ত ব্যাকুল হৃদয়; একটি সিজদা তরে,
মিনার হতে আযান সুর বাজে কর্ণকুহরে।
কী অপরাধে মোরে তুমি বঞ্চিত করিলে?
কোন গুনাহে এ জীবন ধূসর করিলে?
আলোতে আঁধারে আজ শুধু বিরহ সুর বাজে,
প্রভু মোরে নাও ফিরিয়ে তব গৃহে।

কুরআন পড়ো

-মো. জোবাইদুল ইসলাম
আলিম ২য় বর্ষ, সুফিয়া নুরিয়া ফাজিল মাদ্রাসা,
মিরসরাই, চট্টগ্রাম।

কুরআন পড়ো রোজ সকালে
পড়ো রাতের বেলায়,
কুরআন যেনো পড়ে না রয়
তোমার ঘরে হেলায়।
কুরআন পড়ো শুদ্ধ করে
তারতীল সহকারে,
কুরআন পড়ো অর্থ বুঝে
লাগবে তা দরকারে।
কুরআন পড়ো পূণ্য কামাও
কুরআন রবের কালাম,
কুরআন মাঝে আছে হুকুম
দাও মানুষদের সালাম।
কুরআন তোমার মান বাড়াবে
ক্বিয়ামতের দিনে,
তোমার তরে সাক্ষ্য দিবে
সকল স্বার্থ বিনে।

তাওবাতান নাছূহা

-মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক মাহমুদ
শিক্ষক (অবঃ), মনিপুর স্কুল এন্ড কলেজ, মিরপুর, ঢাকা।

'তাওবাতান নাছূহা' মানে, নিষ্কলুষতা ও কল্যাণকামিতা, স্বীয় জীবনকে সুন্দর করে গড়বে, যেন হয় নিজে অন্যের উপদেশদাতা।
অপরাধ করলে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হবে, ভবিষ্যতে ঐ কাজ আর করো না,
পুনঃগুনাহ করা তো দূরের কথা, ঐ কাজের আকাঙ্ক্ষাও করবে না।
এক বেদুঈন ঝটপট করে, তওবা ও ইস্তেগফার পড়ল,
দ্রুত উচ্চারণ করায়, আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাকে বাধা দিলেন।
সত্যিকার তওবা কী জানতে চাইলে, আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন,
খাঁটি তওবার সাথে ছয়টি জিনিস, উল্লেখ তিনি করলেন।
অপরাধ করলে লজ্জিত হও, গাফলতির কাজ সম্পাদন করো,
যার হক্ব তুমি নষ্ট করেছ, তার হক্ব তাকে প্রদান করো।
যাকে তুমি কষ্ট দিয়েছ, তার কাছে মাফ চাও,
প্রতিজ্ঞা করো ভবিষ্যতে, এ গুনাহর দেখা আর না পাও।
নফসকে যে গুনায় অভ্যস্ত রেখেছ, তা আল্লাহর আনুগত্যে নিয়োজিত করো,
এছাড়া যখনই বুঝবে গুনাহ হয়েছে, তখনই তওবা করতে পার।
তওবা করলে মাফ পাবে, এমন কোনো নিশ্চয়তা নাই,
বরং সরল মনে করলে তওবা, মাফের প্রত্যাশা থাকা চাই।
সৎ কর্মের প্রতিদান তো, পার্থিব জীবনে পেয়ে যায়,
জান্নাত পাওয়া আল্লাহর কৃপা, অনুগ্রহের উপর নির্ভর রয়।
হাদীছে রাসূলুল্লাহ বলেন, সৎকর্ম কাউকে মুক্তি দিতে পারে না,
আল্লাহর কৃপা ও রহমত ছাড়া জান্নাত কেহ পেতে পারে না।
ছাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ,
আপনি যে গুনাহমুক্ত, আপনাকে ঠেকাবেন কি আল্লাহ?
হ্যাঁ, আমাকেও! বললেন রাসূল, শুনে ছাহাবীগণ দ্বিধাগ্রস্ত হয়,
সাধ্যানুযায়ী আমল করে যাও, আল্লাহর রহমতের আশায়।
হাশরের ময়দান থেকে ঈমানদারগণ, জান্নাতের দিকে যাবে,
তখন তাদের আগে আগে, নূর অগ্রসর হবে।
নিকষকালো অন্ধকারে, দোযখীরা ঠোকর খেতে থাকবে,
তাদের আর্তনাদ ও বিলাপ শুনে, মুমিনরা একটু ভয় পাবে।
তাই তারা দু'আ করতে থাকবে, হে আমাদের রব,
জান্নাতে না পৌঁছা পর্যন্ত, মোদের নূর রেখো সাথ।
'নূর' থেকে বঞ্চিত মুনাফিক্বরা আঁধারে আছাড় খাবে,
তখন মুমিন নূরের পূর্ণতার জন্য, আল্লাহর কাছে দু'আ করবে।

বাংলাদেশ সংবাদ

বিস্ময়জাগানো 'পঞ্চব্রীহি' ধান : এক রোপনে পাঁচ ফলন

জমিতে এক গাছে ধানের পাঁচ ফলনের ঘটনা পৃথিবীতে বিরল। মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলার হাজীপুর ইউনিয়নের কানিহাটি গ্রামে এক ধান গাছে পাঁচ বার ফলন দিবে। এমন এক নতুন জাতের ধান গাছ উদ্ভাবন করেছেন অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী ধান গবেষক ও জিনবিজ্ঞানী আবেদ চৌধুরী। এই জমির ধান সাধারণ নয়, এই ধান ভিন্ন প্রকৃতির। বিস্ময়জাগানো পাকা ফসল কাটা শুরু হয়েছে। চারা রোপনের পর এ নিয়ে পঞ্চম বারের মতো ধান কাটা হলো। এক বার রোপণে এ ধানের গাছে বছরজুড়ে পাঁচ বার ফলন আসায় নিভৃত কানিহাটি গ্রাম থেকে সৃষ্টি হয়েছে নতুন এক ইতিহাস। আবেদ চৌধুরী জানান, বোরো হিসেবে গত বছরের প্রথমে লাগানো এ ধান ১১০ দিন পর পেকেছে। একই গাছে পর্যায়ক্রমে ৪৫ থেকে ৫০ দিন পরপর এক বার বোরো, দুই বার আউশ এবং দুই বার আমন ধান পেকেছে। ইতোমধ্যে কৃষকরা এক জমি থেকে পাঁচ বার ধান কেটেছেন। কম সময়ে পাকা এই ধানের উৎপাদন বেশি, খরচও কম। তবে প্রথম ফলনের চেয়ে পরের ফলনগুলোতে উৎপাদন কিছুটা কম। কিন্তু পাঁচ বারের ফলন মিলিয়ে উৎপাদন প্রায় পাঁচ গুণ বেশি। আবেদ চৌধুরী এক গাছেই ছয় বার ফসল তোলার গবেষণা চালিয়ে যাবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। পাশাপাশি নতুন জাতের ধান সারা দেশেই চাষাবাদ সম্ভব কিনা তা যাচাই করবেন। এজন্য বিভিন্ন জেলায় এ ধানের পরীক্ষামূলক চাষ করবেন। কুলাউড়ার কানিহাটি গ্রামের সন্তান আবেদ চৌধুরী যুক্তরাষ্ট্রে কৃষি বিষয়ে উচ্চশিক্ষা শেষে চাকরি নিয়ে চলে যান অস্ট্রেলিয়ায়। সেখানকার জাতীয় গবেষণা সংস্থার প্রধান ধানবিজ্ঞানী হিসেবে ধানের জিন নিয়ে গবেষণা করে কাটিয়ে দিয়েছেন ২০ বছর। এ পর্যন্ত তিনি প্রায় ৩০০ রকমের নতুন ধান উদ্ভাবন করেছেন। ধান গাছের দ্বিতীয় জন্ম নিয়ে ১৪ বছর ধরে পরীক্ষানিরীক্ষা চালান আবেদ চৌধুরী। পেশাগত কারণে বিদেশের মাটিতে গবেষণা করলেও দেশে তার গ্রাম কানিহাটিতে গড়ে তুলেছেন খামার। আবেদ চৌধুরী বলেন, আম-কাঁঠালের মতো বছরের পর বছর টিকে থাকার সৌভাগ্য ধান গাছের হয় না— এটা কোনোভাবেই মানতে পারছিলাম না। তাই গবেষণা শুরু করি। একই গাছ থেকে পাঁচ বার ধান বেরিয়ে আসে। ফলে এই ধানের নাম তিনি দিতে চান 'পঞ্চব্রীহি'।

দেশে ডায়াবেটিস ভয়াবহ আকারে বাড়ছে

বাংলাদেশে যেমন ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা বেশি, তেমনি ডায়াবেটিস বৃদ্ধির হারও বেশি। ২০১৯ সালে বাংলাদেশের স্থান শীর্ষ ১০ ডায়াবেটিস সংখ্যাধিক্য দেশের মধ্যে দশম। কিন্তু আরও ভয়াবহ তথ্য হলো, ২০৩০ ও ২০৪৫ সালে বাংলাদেশ নবম অবস্থানে থাকবে। আন্তর্জাতিক ডায়াবেটিস ফেডারেশনের হিসাব মতে, ২০১৯ সালে প্রতি ১১ জন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের একজন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ছিলেন, যার মোট পরিমাণ ৪২৫ মিলিয়ন। ২০৪৫ সালে ৪৮ শতাংশ বেড়ে তা ৬২৯ মিলিয়ন হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। পৃথিবীর মোট ডায়াবেটিস রোগীর ৮৭ শতাংশই উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলোতে বাস করছেন। জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (নিপোর্ট)-এর একটি জরিপে বলা হয়, বাংলাদেশের মোট ডায়াবেটিস আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ১ কোটি ১০ লক্ষ। এদের মধ্যে ১৮-৩৪ বছর বয়সীদের সংখ্যা ২৬ লাখ আর ৩৫ বছরের বেশি বয়সীদের সংখ্যা ৮৪ লক্ষ। বাংলাদেশ বিশ্বের শীর্ষ ১০ ডায়াবেটিস সংখ্যাধিক্য দেশের মধ্যে অন্যতম। পৃথিবীতে বর্তমানে উচ্চ হারে ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে বাংলাদেশ, ভারত ও চীনে। বাংলাদেশসহ সব উন্নয়নশীল দেশে খুব দ্রুত নগরায়ণ হচ্ছে, মানুষের দৈহিক ওজন বৃদ্ধি পাচ্ছে আনুপাতিক ও কাঙ্ক্ষিত হারের চেয়ে বেশি, মানুষের দৈহিক শ্রম দিনে দিনে কমে যাচ্ছে। বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে মানসিক চাপ বেড়েছে অনেকগুণ। উন্নত দেশগুলোতে ডায়াবেটিস রোগীর হার কমলেও তা খুব উল্লেখযোগ্য হারে নয়। অঞ্চল ভেদে মানুষের মধ্যে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার কিছুটা চরিত্রগত ভিন্নতা রয়েছে। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রধানত টাইপ ২ ও অন্যান্য বিশেষ ধরনের ডায়াবেটিস দেখা যায়। গর্ভাবস্থায় প্রথম বার ডায়াবেটিস ধরা পড়ার হারও বৃদ্ধি পাচ্ছে এসব দেশে। উন্নত দেশে নারীদের বেশি সংখ্যায় টাইপ ২ ডায়াবেটিসে ভুগতে দেখা যায়, আর উন্নয়নশীল দেশে পুরুষেরা টাইপ ২ ডায়াবেটিসে বেশি সংখ্যায় ভোগেন। অন্যদিকে বিপুলসংখ্যক তরুণ-তরুণী টাইপ ২ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হচ্ছেন।

আন্তর্জাতিক বিশ্ব

৩০ বছর পর পানি পাবে না বিশ্বের ৫০০ কোটি মানুষ

২৯ বছর পর আর পানি পাবেন না ভারতসহ বিশ্বের ৫০০ কোটির বেশি মানুষ। এমনটাই জানিয়েছে জাতিসংঘ। জাতিসংঘের অধীনস্থ ওয়ার্ল্ড মেটিরিওলজিক্যাল অর্গানাইজেশন (WMO)-এর সাম্প্রতিক রিপোর্টে জানানো হয়েছে, উষ্ণায়নের জেরে দ্রুতহারে আবহাওয়া পরিবর্তনের জন্য পৃথিবীর পানির স্তর উদ্বেগজনকভাবে নিচে নেমে যেতে শুরু করেছে। যা বিশেষভাবে নযরে এসেছে গত ২০ বছরে। ভূপৃষ্ঠ, ভূপৃষ্ঠের ঠিক নিচের স্তর, বরফ ও তুষারে জমা পানির স্তর গত দুই দশকে যে হারে কমেছে, তা আগে কখনো হয়নি। গত ২০ বছরে এই পানির স্তর প্রতি বছরে ১ সেন্টিমিটার করে নেমে যাচ্ছে। আর সেটা ২০১৮ সালেই বুঝতে পেরেছেন বিশ্বের ৩৬০ কোটি মানুষ। বছরে এক মাস তারা কোনো পানিই পাননি। পরিস্থিতি সামলে নেওয়ার জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্র অবিলম্বে ব্যবস্থা না নিতে পারলে ২০৫০ সালে পৌঁছে ছিটেফোঁটা পানিও পাবেন না ভারতসহ বিশ্বের ৫০০ কোটিরও বেশি মানুষ। চরম পানির অভাব দেখা দেবে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম অংশ, ভূমধ্যসাগর, উত্তর ও দক্ষিণ আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, মধ্য এশিয়া, পূর্ব এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়ায়। চরম পানির অভাবে ভুগবে দক্ষিণ-পূর্ব অস্ট্রেলিয়াও। ২০১৮ সালে বিশ্বজুড়ে অন্তত ৩০৬ কোটি মানুষ এক মাসের পানি সংকটে ভুগেছেন। ২০৫০ সালের মধ্যে এই সংখ্যাই পৌঁছে যাবে ৫০০ কোটিতে।

বলা হয়েছে, আগামী ২৯ বছরের মধ্যে এই পানি সংকট এড়াতে চাইলে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে হবে। পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে প্রয়োজনমতো, লাগাতে হবে প্রচুর গাছ। দিন দিন পৃথিবীর উষ্ণতা বেড়েই চলেছে, এর ফলে প্রকৃতির আচরণে বদল আসছে। সময়মতো বৃষ্টি হচ্ছে না। কখনো বন্যা, কখনো খরায় ভুগতে হচ্ছে মানুষকে। এতে চাষের কাজেও ক্ষতি হচ্ছে। সংকট দেখা দিচ্ছে খাদ্যের। গত ২০ বছরেও পানীয় পানি অনেকটা কমে এসেছে। পৃথিবীর মাত্র ০.৫ শতাংশ পানি মানুষের ব্যবহারের যোগ্য।

মুসলিম বিশ্ব

১১৪৯ ফিলিস্তীনী শিশুকে বন্দি করেছে ইসরাঈল

চলতি বছরের শুরু থেকে এ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ১১ শ' ফিলিস্তীনী শিশুকে বন্দি করেছে ইসরাঈল। বিশ্ব শিশু দিবসে এই পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে ফিলিস্তীনের মানবাধিকার গ্রুপ। প্যালেস্টাইনিয়ান প্রিজনার্স সোসাইটি জানায়, এক বছরেরও কম সময়ে ১১৪৯ ফিলিস্তীনী শিশু ইসরাঈলের হাতে বন্দি হয়েছে। অবশ্য তাদের বেশিরভাগকেই পরে ছেড়ে দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে ১৬০ শিশু এখনও দামুন ও মেগিদো কারাগারে বন্দি। মানবাধিকার সংস্থাটির বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, গ্রেফতার শিশুদের দুই-তৃতীয়াংশই শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। বন্দি সব শিশু কারাগারে থেকে মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। প্যালেস্টাইনিয়ান প্রিজনার্স সোসাইটি আরও জানায়, ২০০০ সাল থেকে এ পর্যন্ত অন্তত ১৯ হাজার শিশুকে বন্দি করা হয়েছে; যাদের বয়স ১০ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে।

সাইন্স ওয়ার্ল্ড

সুঁইবিহীন ও ব্যথামুক্ত ইনজেকশন আসছে

নেদারল্যান্ডের গবেষকরা সুচ ছাড়া 'কার্যত বেদনাহীন' ইনজেকশন তৈরি করেছেন। তারা আশা করছেন, যুগান্তকারী এই আবিষ্কার ইনজেকশন ভীতি লাঘব করবে এবং টিকা নিতে সবাইকে উৎসাহিত করবে। 'বাবল গান' নামের এই ইনজেকশন আবিষ্কার করেছেন টুয়েন্টি ইউনিভার্সিটি এবং ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির গবেষকরা। এর মাধ্যমে আরও অল্প সময়ে টিকা দেওয়া হয়ে যাবে। মশার কামড়ের চেয়ে কম ব্যথা লাগবে। কারণ এ প্রক্রিয়া ত্বকের নিচে থাকা নার্ভকে স্পর্শই করবে না। বাণিজ্যিকভাবে এটি বাজারে আসতে তিন বছর সময় লাগতে পারে। এর আগে সম্পন্ন হবে আরো পরীক্ষানিরীক্ষা এবং অনুমোদনের প্রক্রিয়া। লেজার প্রযুক্তি ব্যবহার করে ত্বকের উপরে থাকা ছিদ্রে চাপ দিয়ে, নির্ধারিত পরিমাণ তরল শরীরে প্রবেশ করানো হবে। বাবল গানে টিকা দেওয়ার মাধ্যমে সুঁইভীতি দূর, সুঁই থেকে ছড়ানো সংক্রমণরোধ, ত্বকের নিচের উপরিভাগে পুশ করায় রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা ভালোভাবে কাজ করবে।

সওয়াল-জওয়াব

ফাতাওয়া বোর্ড, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

ইমান-আক্বীদা

প্রশ্ন (১) : আল্লাহকে গড, ঈশ্বর, খোদা, ভগবান ইত্যাদি বলা যাবে কি?

-আহসানুল্লাহ
মণ্ডলপাড়া, গোপীনাথপুর।

উত্তর : আল্লাহকে তার নির্ধারিত নামেই ডাকতে হবে। কেননা নামের কখনো পরিবর্তন হয় না এবং অর্থের বিবেচনায় নাম বাদ দিয়ে উক্ত নামের অর্থ নাম হতে পারে না। যেমন: আব্দুল্লাহ নামের ব্যক্তিকে আব্দুল্লাহ-ই ডাকতে হবে অর্থের বিবেচনায় আল্লাহর বান্দা বলে সম্বধোন করার দ্বারা উদ্দেশ্যে পুরণ হবে না। আর আল্লাহর নামের ক্ষেত্রে তো এমনটি করাই যাবে না। কেননা আল্লাহ তাঁকে তাঁর নির্ধারিত নামে ডাকার আদেশ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর আল্লাহর রয়েছে সব উত্তম নাম। কাজেই সে নাম ধরেই তাঁকে ডাকো। আর যারা তাঁর নাম সম্বন্ধে বক্রপথে চলে তাদেরকে বর্জন করো, তাদের কৃতকর্মের ফল তাদেরকে দেওয়া হবে' (আল-আ'রাফ, ১৮০)। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহর নিরানব্বই অর্থাৎ এক কম একশটি নাম রয়েছে, যে ব্যক্তি তা স্মরণ রাখবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে' (তিরমিযী, হা/৩৫০৭)।

প্রশ্ন (২) : শয়তান কি আমাদের অন্তরের কোনো বিষয় যেমন. কল্পনা, ইচ্ছা, চিন্তা-ভাবনা ইত্যাদি অনুধাবন করতে পারে?

-মো. নেকবার আলি
মুর্শিদাবাদ, ওয়েস্ট বেঙ্গল, ইন্ডিয়া।

উত্তর : শয়তানসহ কোনো মাখলূক মানুষের অন্তরের খবর জানে না। অন্তর্যামী শুধুমাত্র আল্লাহ। মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয় তিনি অন্তর্যামী' (আল-মুলক, ৬৭/১৩)। তবে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত হায়াত দিয়েছেন। সে মানুষকে দ্বীন ইসলাম থেকে বিচ্যুত করার যাবতীয় কলা-কৌশল ব্যবহার করবে। গুনাহের কাজ লোভনীয় করে পেশ করবে এবং মানুষের শিরায় শিরায় মিশে থাকবে। মহান আল্লাহ বলেন, শয়তান বলল, আপনি আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। আল্লাহ বললেন, 'তুমি অবকাশ প্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত/তোমাকে সময় দেওয়া হল' (আল-আ'রাফ, ৭/১৪-১৫)। আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'নিশ্চয় শয়তান মানুষের রক্তনালীতে চলাচল করে (অর্থাৎ রক্ত যেমন মানুষের দেহে চলাচল করে, কোনো সময়ের জন্য বন্ধ হয় না ঠিক তেমনিভাবে শয়তান মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য সর্বদায় অপচেষ্টা চালিয়ে যায় এবং তার পিছে লেগে থাকে' (ছহীহ মুসলিম, হা/২১৭৪; মিশকাত, হা/৬৮)।

শিরক

প্রশ্ন (৩) : শিক্ষক, পিতা-মাতা বা কোনো সম্মানিত ব্যক্তির কদমবুসি (চুমু দেওয়া) করা যাবে কি?

-জহিরুল ইসলাম
বাসাইল, টাঙ্গাইল।

উত্তর : শিক্ষক পিতা-মাতাসহ কোনো সম্মানিত ব্যক্তির কদমবুসি (চুমু দেওয়া) করা যাবে না। পৃথিবীর সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কোনো ছাহাবী কিংবা তাঁর আদরের কন্যা ফাতেমা রাযিয়াল্লা-হু আনহা, তাঁর এগার জন স্ত্রীর কেউ তাঁর কদমবুসি করেছেন এর কোনো প্রমাণ নেই। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দাঁড়িয়ে সম্মান করাকে অপছন্দ করতেন। আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ছাহাবীদের কাছে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেয়েও প্রিয় কোন ব্যক্তি ছিল না। কিন্তু তাঁকে দেখেও তারা দাঁড়াতেন না। কেননা, তাঁরা জানতেন যে, তিনি দাঁড়ানো পছন্দ করেন না' (মিশকাত, হা/ ৪৬৯৮; তিরমিযী, হা/২৭৫৪; সিলসিলা ছহীহা, হা/৩৫৮)।

প্রশ্ন (৪) : দোকানে তাবিযের মাদুলী বিক্রি করা যাবে কি?

-খোকন
চাঁদপুর।

উত্তর : তাবিয ব্যবহার করা, গলায় বা কোমরে ঝুলানো শিরক। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ 'যে ব্যক্তি তাবিয ঝুলালো সে শিরক করল' (মুসনাদে আহমাদ, হা/১৬৭৮১)। আর যা ব্যবহার করা হারাম তা বিক্রয় করাও হারাম। যেমন বিড়ি-সিগারেট খাওয়া হারাম এজন্য তার ব্যবসাও হারাম। তাবিযের মাদুলী যদিও তাবিয নয় কিন্তু তাবিয তার মধ্যে ঢুকিয়ে ব্যবহার করা হয়। সুতরাং তাবিযের মাদুলী বিক্রয় করার মাধ্যমে অন্যায় কাজে সহযোগিতা করা হয়। আর অন্যায় কাজে সহযোগিতা করা হারাম। মহান আল্লাহ বলেন, تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ 'তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহ ভীতিতে পরস্পরকে সহযোগিতা করো আর পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না' (আল-মায়েদা, ৫/২)।

প্রশ্ন (৫) : আমার মা পাইলসের রুগী। এজন্য তিনি এক মহিলার নিকট থেকে একটা গাছের শেকড় তাবিযের মতো করে কোমরে ঝুলিয়ে রেখেছেন। এখন এটা কি তা'বীয? এটা ঝুলানো কি জায়েয? যদি তাবিয হয় তাহলে আমি কীভাবে তাকে বুঝাব?

-আমাতুল্লাহ
কবিরহাট, নোয়াখালী।

উত্তর : রোগ মুক্তি, নারী-পুরুষের মাঝে সম্পর্ক স্থাপনসহ যেকোনো উদ্দেশ্যে সুতা, গাছের ছিলকাসহ ধাতব যা কিছু শরীরে ঝুলানো হয় তাই তাবিয। আর তাবিয ঝুলানো সরাসরি শিরক। রাসূল ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তাবিয ঝুলাল সে শিরক করল' (মুসনাদে আহমাদ, হা/১৭৪৫৮)। তাবিয ঝুলানোর দ্বারা অবসন্নতা বৃদ্ধি পায়। ইমরান ইবনু হুসাইন রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ এক ব্যক্তির হাতে পিতলের বালা পরিহিত দেখে জিজ্ঞেস করেন, এই বালাটা কী? সে বললো, এটা অবসন্নতা জনিত রোগের জন্য ধারণ করেছি। তিনি বলেন, এটা খুলে ফেলো। অন্যথায় তা তোমার অবসন্নতা বৃদ্ধিই করবে (ইবনু মাজাহ, হা/৩৫৩১)। **দ্বিতীয়ত,** তাবিয মানুষের কোনো উপকার করতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর যদি আল্লাহ আপনাকে কষ্ট দেন তবে তিনি ব্যতীত তা অপসারণকারী কেউ নেই' (আল-আন'আম, ৬/১৭)। আপনি আপনার মাকে তাবিয শিরক বা এর ভয়াবহতা বিষয়ক বই কিনে দিতে পারেন। আপনি নিজে তাকে মৃত্যুর পর শিরককারীর পরিণতি সম্পর্কে নছীহার মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করুন। আল্লাহ চাহেন তো বুঝার তাওফীক্ব দান করবেন; ইনশা-আল্লাহ!

ইবাদত-ছালাত

প্রশ্ন (৬) : আমি কোথাও শুনেছিলাম পরিবারের সকলে মিলে জামা'আত সহকারে ছালাত আদায় করা অধিক ছওয়াবের কাজ। এটা কি মসজিদে জামা'আতে আদায়ের থেকেও বেশি ছওয়াবের না-কি কোন ক্ষেত্র বিশেষ অধিক ছওয়াব?

-মাহমুদুল হাসান
ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। বরং পুরুষের জন্য আযান শোনার পর মসজিদে গিয়ে জামা'আত সহকারে (ফরয) ছালাত আদায় করা ওয়াজিব। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আযান শুনার পর কোনো শারয়ী ওযর ব্যতীত আযানের জবাব (মসজিদে আসলা না) দিল না। তার কোনো ছালাত নেই' (ইবনু মাজাহ, হা/৭৯৩; মিশকাত, হা/১০৭৭)। শুধু তাই নয় যারা ফরয ছালাত মসজিদে জামা'আতের সাথে আদায় করতে যায় না, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বাড়ি-ঘর আগুন দ্বারা পুড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন। (ছহীহ বুখারী, হা/৬৪৪, ২৪২০)। ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ অধ্যায় রচনা করেছেন এভাবে بَابُ وُجُوْبِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ অর্থাৎ 'জামা'আতে ছালাত আদায় করা ওয়াজিব'। ইবনু উম্মু মাকতুম রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি অন্ধ তদুপরি মসজিদও আমার ঘর হতে অনেক দূরে, আমাকে মসজিদে আনা-নেওয়ার জন্য কোনো লোক নেই। এমতাবস্থায় আমি কি ঘরে (ফরয) ছালাত আদায় করতে পারি? নবী ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি আযান শুনতে পাও'? আমি বললাম, হ্যাঁ। নবী ﷺ বললেন, 'আমি তোমার জন্য (জামা'আত) থেকে অব্যাহতির কোনো কারণ পাচ্ছি না' (ছহীহ মুসলিম, হা/৬৫৩; আবূ দাউদ, হা/৫৫২)। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমরা তোমাদের বাড়িতেও কিছু কিছু ছালাত আদায় করবে এবং ঘরকে কবরে পরিণত করবে না। (ছহীহ বুখারী, হা/৪৩২; ছহীহ মুসলিম, হা/৭৭৭)। বাড়িতে নফল ছালাত মাহরাম মহিলাদের সাথে গায়রে মাহরাম হলে পর্দার ব্যবস্থা করে জামা'আতসহ আদায় করা যায়। এক্ষেত্রে অবশ্যই পুরুষ সামনে দাঁড়াবে পিছনে মহিলাগণ দাঁড়াবে (ছহীহ বুখারী, হা/৭২৭; মিশকাত, হা/১১০৪)।

প্রশ্ন (৭) : ছালাতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা কীভাবে পড়ব। যদিও আমি ইমাম বুখারীর লিখিত জুয'উল ক্বিরা'আত বইটি পড়েছি। ২৭৩, ২৭৪, ২৮৩, ২৮৪ সিরিয়ালে যা বর্ণিত তাতে দুই সাকতার মাঝে পড়ার কথা আছে। যদি প্রথম সাকতায় সূরা ফাতিহা পড়ে ফেলি তাহলে ইমামকে অনুসরণের বিষয়ে বর্ণিত হাদীছের জবাব কী হবে? আমি কীভাবে আমল করব?

-মো. দাউদ হোসেন
মহেশপুর, ঝিনাইদাহ।

উত্তর : সূরা ফাতিহা ইমামের পিছনে চুপে চুপে এবং ইমামের প্রতি আয়াত পাঠের পরে পরে পড়তে হবে। তাকবীরে তাহরীমার পরবর্তী সাকতার সময় নয়। তাহলে ইমামের অনুসরণ হয়ে যাবে। কেননা তাকবীরে তাহরীমা এবং সূরা ফাতিহার মধ্যবর্তী সাকতা (নিরবতা) মূলত সানা পড়ার জন্য (নাসাঈ, হা/৮৯৫; মুসনাদে আহমাদ, হা/১০৪১৩)। আলী ইবনু হুজর রাহিমাহুল্লাহ আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ছালাত আরম্ভ করার পর অল্পক্ষণ নীরব থাকতেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক; তাকবীর ও ক্বিরা'আতের মধ্যবর্তী নীরবতার সময় আপনি কি পড়েন? তিনি বলেন, আমি তখন পড়ি:

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

দুই সাকতার (অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমার পর এবং সূরা ফাতিহার পর) হাদীছ যঈফ (আবূ দাউদ, হা/৭৭৭, ৭৭৯; ইরওয়া, হা/৫০৫)। ইমাম সূরা ফাতিহা পাঠ করার পর চুপ থাকা এবং মুক্তাদীগণ সূরা ফাতিহা পাঠ করা মর্মে কোনো হাদীছ নেই। ছাহাবীগণ ইমামের সাথে সাথে সরবে তেলাওয়াত করতেন বলেই রাসূল ﷺ-এর তেলাওয়াতে সমস্যা হত। তাই তিনি তাদেরকে নীরবে পাঠ করার নির্দেশ প্রদান করে ছিলেন। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ 'তুমি তা নীরবে পাঠ করো' (ছহীহ মুসলিম, হা/৩৯৫; মিশকাত, হা/৮২৩)।

প্রশ্ন (৮) : রুকূ পেলে পূর্ণ রাকা'আত হিসাবে গণ্য হয়। কিন্তু ইমাম বুখারীর লিখিত জুয'উল ক্বিরা'আত বইয়ে বর্ণিত অনেক হাদীছ প্রমাণ করে যে, সূরা ফাতিহা ছাড়া ছালাত হয় না। এই বিরোধপূর্ণ হাদীছের সমাধান কী?

-রাশেদ খান মেনন
নিলফামারী।

উত্তর : সূরা ফাতিহা ব্যতীত ছালাত হবে না এ কথাই ঠিক। উবাদা ইবনু ছামেত রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করল না তার ছালাত নেই' (ছহীহ বুখারী, হা/৭৫৬)। আবার রুকূ' পেলে রাকা'আত গণ্য হবে মর্মেও ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'তোমরা ছালাতে এসে আমাদেরকে সিজদা অবস্থায় পেলে সিজদায় চলে যাবে। তবে এ সিজদাকে (ছালাতের রাক'আত) গণ্য করবে না। আর যে ব্যক্তি রুকূ পেলো সে ছালাত (রাকা'আত) পেয়েছে (আবূ দাউদ, হা/৮৯৩; মুসতাদরাক আলাছ-ছহীহাইন, হা/১০১২)। **সমাধান:** প্রথম হাদীছ দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, কেউ দাঁড়ানো অবস্থায় সূরা ফাতিহা পাঠের সময় পাওয়ার পরেও যদি সূরা ফাতিহা পাঠ না করে, তাহলে তার ছালাত হবে না। দ্বিতীয় হাদীছ দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, কেউ যদি ইমামকে সরাসরি রুকূ'তে পায় এবং ফাতিহা পাঠের সময় না পায় তাহলে, তার জন্য উক্ত রুকূ রাকা'আত হিসাবে গণ্য হবে। কেননা সে সূরা ফাতিহা পাঠের সময় পায়নি। সুতরাং দুই হাদীছের মাঝে কোনো বিরোধ নেই। আবূ বাকরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, একদা তিনি মসজিদে এসে নবী ﷺ-কে রুকূ'তে দেখে কাতারে শামিল না হয়েই রুকূতে যান। শেষে তিনি কাতারে গিয়ে শামিল হন। ছালাতান্তে নবী ﷺ বলেন, 'তোমাদের কোন ব্যক্তি কাতারে শামিল হওয়ার পূর্বে রুকূ' করেছে, অতঃপর সে কাতারে শামিল হয়েছে? আবূ বাকরা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি। নবী ﷺ বললেন, 'আল্লাহ ইবাদতের প্রতি তোমার আগ্রহ করুন! তুমি পুনর্বার এরূপ করবে না (আবূ দাউদ, হা/৬৮৪)। অত্র হাদীছে আল্লাহর নবী ছাহাবী আবূ বাকরা রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে রুকূ' প্রাপ্ত রাকা'আতকে আবার পড়ার ব্যাপারে কিছুই বলেননি। যদি তা রাকা'আত হিসাবে গণ্য না হত তাহলে অবশ্যই তাকে ঐ রাকা'আত পড়ার নির্দেশ দিতেন।

প্রশ্ন (৯) : আমি হানাফী ইমামের পিছনে ছালাত পড়ি। কখনো কখনো ইমামের সাহু সিজদার প্রয়োজন হয়। এমতাবস্থায় ইমামের সাথে সুন্নাহ পরিপন্থি পদ্ধতিতে সাহু সিজদা দিব না-কি একা একা সুন্নাহ পদ্ধতিতে সাহু সিজদা দিয়ে সালাম ফিরিয়ে নিব?

-এবাদুল হক হাওলাদার
গোপালগঞ্জ।

উত্তর : এ অবস্থায় ইমামের সাথেই থাকতে হবে। কেননা ইমাম নির্ধারণ করা হয় তার অনুসরণের জন্য। রাসূল ﷺ বলেন, إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ 'ইমাম নির্ধারণ করা হয় তার অনুসরণ করার জন্য' (ছহীহ বুখারী, হা/৭৩৪; আবূ দাউদ, হা/৬০৫; মিশকাত, হা/৮৫৭)। সুতরাং ইমামের পূর্বে কোনো কাজ করা বৈধ নয়। এতে কোনো ক্ষতি হলে তা ইমামের উপর বর্তাবে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ 'তারা তোমাদের ইমামতি করে। যদি তারা সঠিকভাবে আদায় করে তাহলে তার ছওয়াব তোমরা পাবে। আর যদি তারা ত্রুটি করে, তাহলে তোমাদের জন্য ছওয়াব রয়েছে, আর ত্রুটি তাদের (ইমামের) উপরই বর্তাবে' (ছহীহ বুখারী, হা/৬৯৪; মিশকাত, হা/১১৩৩)।

প্রশ্ন (১০) : একই ছালাত নাম ৩টা। ইশরাক্ব, চাশত, আওয়াবীন। ইশরাক্বের ছালাত আদায় করলে বাকি ২টা (চাশত, আওয়াবীন) আদায় করা যাবে কি? আর যদিও করি, তাহলে কি ছওয়াব পাওয়া যাবে? দয়া করে জানাবেন।

-নজরুল ইসলাম
দূর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তর : ইশরাক্বের ছালাত দিনে একবার আদায় করে নিলে দ্বিতীয়বার আদায় করা যাবে না। কেননা নাম ভিন্ন হলেও ছালাত একই। মূলত হাদীছে صلاة الضحى নামটি এসেছে (মিশকাত, হা/১৩১০)। এই ছালাত আদায়ের সময় যেহেতু রোদ্রের তীব্রতা থাকে তাই ইশরাক্ব বলা হয়। ফার্সী ভাষায় চাশত বলা হয়। আর এর আদায়কারীদের أوابين (আওয়াবীন- আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী) বলা হয়।

প্রশ্ন (১১) : পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতে মহিলা মহিলাদের ইমাম হতে পারবে কি? যদি হতে পারে তাহলে জাহরী ছালাতে ক্বিরা'আত উচ্চৈস্বরে পড়বে না-কি নিম্নস্বরে?

-আকতার
সুনামগঞ্জ।

উত্তর : মহিলা মহিলার ইমামতিতে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করতে পারে। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত, أَنَّهَا كَانَتْ تُؤَذِّنُ وَتُقِيمُ وَتَؤُمُّ النِّسَاءَ وَتَقُومُ وَسَطَهُنَّ. 'অর্থাৎ তিনি আযান ও ইক্বামত দিতেন এবং মহিলাদের ইমামতি করতেন। এ সময় তিনি কাতারের মাঝে দাঁড়াতেন' (সুনানুল কুবরা 'বায়হাক্বী', হা/১৯৯৮, ৫৫৬২ 'সনদ ছহীহ')। রমাযান মাসে উম্মু ওয়ারাক্বা বিনতু আব্দুল্লাহ ইবনুল হারিছ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)-কে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইমামতির দায়িত্ব অর্পণ করে তার বাড়ির সকলকে নিয়ে ছালাত আদায় করার নির্দেশ দিয়ে ছিলেন (আবূ দাঊদ, হা/৫৯২)। তবে জাহরী ছালাতে পার্শ্বস্থ মহিলারা শুনতে পায় এতটুকু নিম্নোস্বরে পড়বে। উল্লেখ্য যে, খুতবা থাকায় জুম'আ ও ইদের ছালাতে মহিলারা ইমামতি করতে পারবে না।

প্রশ্ন (১২) : ইমামকে শেষ বৈঠকে পেলে কয়টি তাকবীর দিয়ে বসতে হবে? এখানে কি রাফউল ইয়াদাঈন করে বসতে হবে?

-রাহাত
মিরপুর-১০।

উত্তর : ইমামকে শেষ বৈঠক বা যেকোনো অবস্থায় পেলে তাকবীর দিয়ে রাফউল ইয়াদাঈন করে ইমামের সাথে শরিক হয়ে যেতে হবে। আলী ও মু'আয ইবনু জাবাল (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তারা দুইজন বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ ছালাতে উপস্থিত হয়ে ইমামকে কোনো এক অবস্থায় পাবে, তখন ইমাম যা করছে সে যেন তাই করে' (তিরমিযী, হা/৫৯২; মিশকাত, হা/১১৪২)। সুতরাং বৈঠকে বসার সময়েও তাকবীর দিয়ে রাফ'উল ইয়াদাঈন করে বসে যাবে। উল্লেখ্য যে, বুকে হাত বাঁধার পর বসার যে প্রথা সমাজে চালু আছে তা দলীল দ্বারা প্রমাণত নয়।

প্রশ্ন (১৩) : বিতর ছালাত ১ রাকা'আত, ৩ রাকা'আত ও ৫ রাকা'আত ইত্যাদি সংখ্যায় পড়া যায়। রাকা'আতের কম-বেশির কারণে বিতর ছালাতের ছওয়াবে কম-বেশি হবে কি?

-মো. আব্দুল ওয়াহেদ
শিবগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তর : নেকীর কম-বেশি নয় বরং রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাহ বাস্তবায়নের মধ্যেই নেকী রয়েছে। যেহেতু এক রাকা'আত বিতর পড়ার প্রমাণে হাদীছের সংখ্যা অনেক বেশি। সেহেতু রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুসরণ করত এক রাকা'আত বিতর পড়াই উত্তম। এছাড়াও আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় আমল হলো, যা নিয়মিত করা হয়। যদি ও তা অল্পই হোক না কেন' (ছহীহ বুখারী, হা/৬৪৬৫; মিশকাত, হা/১২৪২)।

প্রশ্ন (১৪) : কিছু আলেম বলে থাকেন, ছালাতে 'রাফ'উল ইয়াদাঈন' ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাহ কোনোটি নয়। ইহা না করলেও ছালাত হয়ে যাবে। এমন বক্তব্য কি সঠিক?

-মো. আব্দুল গফুর
জিপিও ৯০০০, খুলনা।

উত্তর : রাফ'উল ইয়াদাঈন না করলে ছালাত হয়ে যাবে। তবে রাফ'উল ইয়াদাঈন রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাহ একথা অমান্য করলে নবীর সুন্নাহকে অবজ্ঞা করা হবে। রাফ'উল ইয়াদাঈন ছালাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ। এমনকি রাফ'উল ইয়াদাঈন না করলে ছালাতের ছওয়াব কমে যায়। 'রাফ'উল ইয়াদাঈন' করা সম্পর্কে চার খলীফাসহ প্রায় ২৫ জন ছাহাবী থেকে বর্ণিত ছহীহ হাদীছ রয়েছে। এক হিসাব মতে 'রাফঊল ইয়াদাঈন'-এর হাদীছের রাবী সংখ্যা 'আশারায়ে মুবাশশারাহ'সহ ৫০ জন ছাহাবী। এবং সর্বমোট ছহীহ হাদীছ ও আছারের সংখ্যা কমপক্ষে চার শত। ইমাম সুয়ূত্বী ও আলবানী প্রমুখ বিদ্বানগণ 'রাফ'উল ইয়াদাঈন'-এর হাদীছকে 'মুতাওয়াতির' (যা ব্যাপকভাবে ও অবিরত ধারায় বর্ণিত) পর্যায়ের বলে মন্তব্য করেছেন। (তুহফাতুল আহওয়াযী, ২/১০০, ১০৬ পৃ.; আলবানী, ছিফাতু ছালা-তিন্নবী, পৃ. ১০৯)। ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন, لَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ تَرْكُهُ. وقَالَ لاَ أَسَانِيْدَ أَصَحُّ مِنْ أَسَانِيْدِ الرَّفْعِ অর্থাৎ কোনো ছাহাবী রাফ'উল ইয়াদাঈন তরক করেছেন বলে প্রমাণিত হয়নি। তিনি আরও বলেন 'রাফ'উল ইয়াদাঈন'-এর হাদীছ সমূহের সনদের চেয়ে বিশুদ্ধতম সনদ আর নেই' (ফৎহুল বারী, ২/২৫৭ পৃ., হা/৭৩৬-এর ব্যাখ্যা)। সুতরাং রাফ'উল ইয়াদাঈনকে উপেক্ষা করার কোনোই সুযোগ নেই। কেউ যদি স্বেচ্ছায় তা উপেক্ষা করে তাহলে সে সুন্নাহকে অমান্য করল (ছহীহ ইবনু খুযায়মা, হা/১৯৭; সিলসিলা ছহীহা, হা/২১৩০)। ছালাতে রাফ'উল ইয়াদাঈনের জন্য ১০টি করে নেকী বেশি হয় (সিলসিলা ছহীহা, হা/৩২৮৬)। উক্ববা ইবনু আমের জুহানী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, যখন মুছল্লী রুকূতে যাওয়ার সময় এবং রুকূ থেকে উঠার সময় দুই হাত উত্তোলন করবে তখন তার জন্য প্রত্যেক ইশারায় দশটি করে নেকী হবে (বায়হাক্বী, মা'রেফাতুস সুনান, হা/৮৩৯; আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন নবী, পৃ. ১২৯)। পক্ষান্তরে, রাফ'উল ইয়াদাঈন না করলে ছালাতের নেকী কম হয়। আম্মার ইবনু ইয়াসার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, এমন অনেক লোক আছে যারা ছালাত আদায় করে কিন্তু তাদের ছালাত পুরাপুরি কবুল না হওয়ায় পরিপূর্ণ নেকী প্রাপ্ত হয় না। বরং তাদের কেউ দশ ভাগের এক ভাগ, কেউ নয় ভাগের এক ভাগ, কেউ আট ভাগের এক ভাগ, কেউ সাত ভাগের এক ভাগ, কেউ ছয়

ভাগের এক ভাগ, কেউ পাঁচ ভাগের এক ভাগ, কেউ চার ভাগের এক ভাগ, কেউ তিনের একাংশ বা অর্ধাংশ নেকী প্রাপ্ত হয়ে থাকে (আবূ দাঊদ, হা/৭৯৬)।

প্রশ্ন (১৫) : যোহরের ফরয ছালাতের পূর্বের চার রাকা'আত সুন্নাত এক সালামে পড়তে হবে না-কি দুই সালামে?

-মো. আব্দুল গফুর
জিপিও ৯০০০, খুলনা।

উত্তর : যোহরের পূর্বের চার রাকা'আত ছালাত এক সালামেও পড়া যায় দুই সালামেও পড়া যায়। ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল ﷺ বলেছেন, صَلاَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى 'রাতের এবং দিনের ছালাত দুই দুই রাকা'আত করে' (আবূ দাউদ, হা/১২৯৫; নাসঈ, হা/১৬৬৬)। অত্র হাদীছ প্রমাণ করে যে, দিন-রাতের সকল নফল ছালাত দুই দুই রাকা'আত করে পড়া সুন্নাত। তবে যে সকল নফল ছালাত এক সালামে চার রাকা'আত প্রমাণিত হয়েছে সে ছালাতগুলো উক্ত হাদীছের আওতাভুক্ত হবে না। আর যোহরের পূর্বের চার রাকা'আত ছালাত এক সালামে পড়া যাবে মর্মে ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে (ইবনু মাজাহ, হা/১১৯২)।

প্রশ্ন (১৬) : ছালাতে যে অঙ্গ ঢেকে রাখা ফরয, তার মাঝে যদি সামান্য ছিদ্র থাকে, তাহলে ছালাত শুদ্ধ হবে কি?

-সদরুদ্দীন
ঢাকা।

উত্তর : নারী-পুরুষ সকলের জন্য ছালাতে সতর ঢেকে রাখা শর্ত এবং আবশ্যক (আল-মুগনী, ১/৩৩৭)। কেননা সতর খোলা অবস্থায় ছালাত কবুল হয় না। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ 'কোনো প্রাপ্তবয়স্কা মহিলা ওড়না ছাড়া ছালাত আদায় করলে, আল্লাহ তার ছালাত কবুল করবেন না' (ইবনু মাজাহ, হা/৬৫৫; মুসনাদে আহমাদ, হা/২৫৮৭৬)। সুতরাং স্বেচ্ছায় কোনো ব্যক্তি সতর খোলা রেখে ছালাত আদায় করলে তার ছালাত বাতিল হবে। তাই এই ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে এবং সতর বের হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে এমন পোশাক পরিধান করা হতে বিরত থাকতে হবে। আর অজ্ঞতা বা ভুলক্রমে যদি সতরের কোনো অঙ্গ ছালাতে খুলে যায় তাহলে তার ছালাত হয়ে যাবে। কেননা আল্লাহ বান্দার অনিচ্ছাকৃত ভুল ক্ষমা করে দিয়েছেন (ইবনু মাজাহ, হা/২০৪৫; মিশকাত, হা/৬২৮৪)। আর ছিদ্র যদি অতি সামান্য হয়ে থাকে যার কারণে সতর দেখা যায় না বা মানুষের নজরে পড়ে না, তাহলে এমন ছিদ্রের কারণে ছালাতের কোনো সমস্যা হবে না।

প্রশ্ন (১৭) : কাপড়ে রক্ত ছিটা লেগে থাকাবস্থায় উক্ত কাপড়ে ছালাত আদায় করলে ছালাত শুদ্ধ হবে কি?

-মো. হাফিজুর রহমান
কেএমপি, খুলনা।

উত্তর : রক্ত ছিটা কাপড়ে লেগে থাকাবস্থায় ছালাত আদায় করাতে কোনো সমস্যা নেই। কারণ সাধারণ রক্ত নাপাক নয়। যেমন: একদা রাসূল ﷺ কা'বা চত্বরে ছালাতরত ছিলেন। এমতাবস্থায় আবূ জাহেল, উতবা, শায়বাসহ মক্কার নেতৃস্থানীয় নেতাদের আদেশ ক্রমে সিজদারত অবস্থায় আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর উপর যবেহকৃত উটের নাড়ি-ভুঁড়ি চাপিয়ে দেওয়া হয়। রাসূল ﷺ তাদের উদ্দেশ্যে বদ-দু'আ করেছিলেন (ছহীহ বুখারী, হা/২৪০)। তবুও রাসূল ﷺ ছালাত ছেড়ে দেননি। বরং ছালাত শেষ পর্যন্ত আদায় করেছেন। এছাড়াও এক যুদ্ধ সফরে ঘুমন্ত ছাহাবীদের পাহারায় নিযুক্ত ছালাতরত ছাহাবীকে শত্রু পক্ষ তীর নিক্ষেপ করে, যার ফলে তার শরীর হতে রক্ত প্রবাহিত হয়। পরবর্তীতে রাসূল ﷺ-কে বিষয়টি অবগত করলে, তিনি তাকে পুনরায় ছালাত আদায় করতে বা ছালাত বাতিল মর্মে কোনো কিছুই বলেননি (আবূ দাউদ, হা/১৯৮)। তবে শরীরে বা কাপড়ে নাপাক রক্ত লেগে থাকাবস্থায় ছালাত আদায় করা যাবে না। বরং তা ধুয়ে ছালাত আদায় করতে হবে। যেমন হায়েযের রক্ত। কেননা রাসূল ﷺ হায়েযের রক্ত ধুয়ে ছালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। ফাতেমা বিনতে হুবায়শ রাসূল ﷺ-কে এই মর্মে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলে, إِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي 'যখন তোমার হায়েয শেষ হয়ে যাবে, তখন তুমি তা ধুয়ে ছালাত আদায় করবে' (ছহীহ বুখারী, হা/২২৮)।

প্রশ্ন (১৮) : ২ জনে জামা'আতে ছালাত পড়তেছে। পরবর্তীতে আমি তৃতীয় ব্যক্তি হলে আমি জামা'আতের কোথায় দাঁড়াব?

-মো: সৌরভ
কালিয়াকৈর, গাজীপুর।

উত্তর : এ অবস্থায় ইমামের বাম পাশে দাঁড়িয়ে যেতে হবে। ইমাম যখন দেখবে তার দুই পাশে দুই জন হয়ে গেছে, তখন ইমাম তাদেরকে পিছনে ঠেলে দিবে। জাবের (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল ﷺ ছালাতে দাঁড়ালে আমি এসে তার বাম পাশে দাঁড়ালাম। তখন তিনি আমার হাত ধরে ঘুরিয়ে আমাকে ডান পাশে নিয়ে আসলেন। কিছুক্ষণ পরে জাব্বার ইবনু ছাখর এসে তার বাম পাশে দাঁড়াল। তখন তিনি আমাদের দুজনের হাত ধরে আমাদেরকে ঠেলে দিয়ে তার পিছনে দাঁড় করালেন' (ছহীহ মুসলিম, হা/৩০১০; মিশকাত, হা/১১০৭)।

মসজিদ- নির্মাণ

প্রশ্ন (১৯) : মসজিদের আশে-পাশে যদি কবর থাকে তাহলে ঐ মসজিদে ছালাত বৈধ হবে কি? বিস্তারিত জানাবেন।

-আব্দুর রহমান
ডিমলা, নিলফামারী।

উত্তর : মসজিদকে কবর রূপে গ্রহণ করা হতে সর্বদা বিরত থাকতে হবে। কারণ এ ব্যাপারে রাসূল ﷺ কঠোরতা আরোপ করেছেন। রাসূলের বাণী, 'আল্লাহ ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদেরকে লানত করেছেন। কারণ তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে মসজিদ রূপে গ্রহণ করেছিল' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৩৩০; ছহীহ মুসলিম, হা/৫২৯; মিশকাত, হা/৭১২)। তবে কবর যদি মসজিদের এরিয়ার বাহিরে ডানে-বামে হয় তাহলে কোনো সমস্যা নেই (মাজমূউল ফতওয়া বিন বায, ১৩/৩৫৭ পৃ.)। তবুও সতর্ক স্বরূপ মসজিদের পাশে কবর না দিয়ে কবরস্থানে কবর দেওয়ায় উত্তম হবে। কারণ এতে মূর্খরা ফেতনায় পড়ার সম্ভবনা রয়েছে।

মসজিদ- প্রবেশের সময় সালাম

প্রশ্ন (২০) : মসজিদে প্রবেশের পর মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে যে সালাম দেওয়া হয় তা কতটুকু শরীয়া সম্মত?

-মো. দাউদ হোসেন
মহেশপুর, ঝিনাইদাহ।

উত্তর : মসজিদে প্রবেশের সময় বিসমিল্লাহ বলে রাসূলের উপর দরূদ পাঠ করে মসজিদে প্রবেশের দু'আ পড়ে ডান পা দিয়ে প্রবেশ করা সুন্নাত। অর্থাৎ এইভাবে বলা, بِسْمِ اللَّهِ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى ذُنُوبِى وَافْتَحْ لِى أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ (আবূ দাউদ, হা/৪৬৫; ইবনু মাজাহ, হা/৭৭১; তিরমিযী, হা/৩১৪)। প্রবেশের পর মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে সালাম দেওয়া যায়। কেননা ছালাম দেওয়ার জন্য নিষিদ্ধ কোনো সময় নেই। যদিও পেশাব-পায়খানার সময় সালামের জবাব দেওয়া যাবে না। বরং পরবর্তীতে দিতে হবে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন তার ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, তখন সে যেন তাকে সালাম দেয়। অতঃপর দুজনের মাঝে যদি গাছ, দেয়াল বা পাথর আড়াল হয়ে যায় এবং তারপর আবার সাক্ষাৎ হয়, তাহলেও যেন তাকে সালাম দেয় (আবূ দাউদ, হা/৫২০০; মিশকাত, হা/৪৬৫০)। এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-কে মসজিদে সালাম দিলে রাসূল ﷺ তার উত্তর দিয়ে ছিলেন (ছহীহ বুখারী, হা/৭৫৭; ছহীহ মুসলিম, হা/৩৯৭)। উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন মাযহাবী ফিক্বহের বইয়ে প্রায় ১৪ স্থানে সালাম দেওয়া যাবে না মর্মে বলা হয়েছে। যেমন. আযানের সময়, খাবারের সময়, ওযূর সময় ইত্যাদি। এসব কথার শারঈ কোনো ভিত্তি নেই।

ইবাদত- যাকাত-ওশর

প্রশ্ন (২১) : কোনো ব্যক্তি জমি বন্ধক নিলে তার টাকার যাকাত দিতে হবে না জমির শস্যের ওশর দিতে হবে।

-মোঃ আল আমিন
কাজিপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : প্রচলিত নিয়মে যে বন্ধক দেওয়া হয়ে থাকে তা শরীয়ায় হারাম। তবে যে বন্ধকের জন্য টাকা দেওয়া হয় তা যদি নেসাব পরিমাণ হয় বা তার মূল সম্পদের সাথে মিলিয়ে নেসাব পরিমাণ হয়ে যায় এবং তার উপর ১ বছর অতিবাহিত হয় তাহলে অবশ্যই যাকাত আদায় করতে হবে (আল-মাজমূ', ৫/৩১৮ পৃ.)। তবে যার কাছে বন্ধক রাখা হয়েছে তার অনুমতি নিতে হবে (মাজমূউল ফতওয়া ইবনে উছাইমীন, ১৮/৩৪ পৃ.)। আর টাকার যাকাত স্বর্ণের হিসাবে প্রায় ৫ লাখ টাকা এবং রৌপ্যর হিসাবে প্রায় ৭০ হাজার টাকা। অনুরূপভাবে জমিতে উৎপাদিত ফসলও যদি নেসাব পূর্ণ হয়ে থাকে তাহলে তাতেও যাকাত আদায় করতে হবে। আর ফসলের যাকাত হিসাব হলো- যদি তা সেচের মাধ্যমে হয় তাহলে ২০ ভাগের এক ভাগ দিতে হবে আর যদি বৃষ্টির মাধ্যমে হয় তাহলে ১০ ভাগের ১ ভাগ প্রদান করতে হবে।

প্রশ্ন (২২) : আমরা জানি যে, উৎপাদিত ফসল ১৮ মণ ৩০ কেজি হলে সেচ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপাদিত ফসলে বিশ ভাগের এক ভাগ এবং বৃষ্টি কিংবা প্রাকৃতিক পানির মাধ্যমে উৎপাদিত ফসলে দশ ভাগের এক ভাগ যাকাত (ওশর) দিতে হয়। কিন্তু আমরা এই ভাগের ওশর সবাইকে সমানভাবে দিচ্ছি না। বরং কাউকে ৫ কেজি, কাউকে ৩ কেজি, বা কাউকে ১ কেজি করে দিচ্ছি। এই বণ্টন কি শরীয়ত সম্মত?

-দিলশাদ ইসলাম
পীরগঞ্জ, রংপুর।

উত্তর : ওশর এক প্রকারের যাকাত যা ফসল কর্তনের দিন বের বা প্রদান করতে হয়। মহান আল্লাহ বলেন, وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ 'তোমরা ফসল কাটার দিনে তার হক্ব (যাকাত) দিয়ে দাও' (আল-আন'আম, ০৬/১৪১)। ওশর এবং অন্যান্য যাকাত বণ্টনের খাত একই। মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয় ছাদাক্বা হচ্ছে ফকীর ও মিসকীনদের জন্য এবং এতে নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্য, আর যাদের অন্তর আকৃষ্ট করতে হয় তাদের জন্য; (তা বণ্টন করা যায়) দাস আযাদ করার ক্ষেত্রে, ঋণগ্রস্তদের মধ্যে, আল্লাহর রাস্তায় এবং মুসাফিরদের মধ্যে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়' (আত-তওবা, ০৯/৬০)। এই আট খাতেই যাকাত বণ্টন করতে হবে। তবে বণ্টনের ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও তার প্রয়োজনের ভিত্তিতে কম-বেশ হতে পারে।

ইবাদত-দু'আ

প্রশ্ন (২৩) : মোনাজাতে অনেক আলেমগণ বলতে শোনা যায়, 'সবটুকু ছওয়াব সোনার মদিনা নবী পাকের রওজায় পৌঁছে দিন' এ কথাটা কতুটুকু সঠিক? কুরআন হাদীছের আলোকে ব্যাখ্যা করবেন।

-এবাদুল হক হাওলাদার
গোপালগঞ্জ।

উত্তর : **প্রথমত,** এ ধরনের দু'আর কোনো ভিত্তি নেই। কেননা এই ধরনের দু'আর অস্তিত্ব ছাহাবী, তাবেঈ, তাবে'-তাবেঈদের যুগে ছিল না। বরং এটা পরবর্তী যুগের নব আবিষ্কৃত বিদ'আত। আর যে বিদ'আত করবে, আল্লাহ তার সেই আমল কবুল করবেন না। রাসূল ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করল যার ব্যাপারে শরীয়তের কোনো নির্দেশনা নেই তা প্রত্যাখ্যাত' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮; মিশকাত, হা/৫৩১৫)। **দ্বিতীয়ত,** মানুষ যত ছওয়াবের কাজ করবে তা রাসূল ﷺ-এর আমলনামার মধ্যে এমনিতেই যুক্ত হয়ে যাবে। কেননা কোনো ব্যক্তি যদি কাউকে কোনো কল্যাণময় কাজের পথ দেখায়, তাহলে তার এই প্রদর্শিত পথের উপর পরবর্তী যত মানুষ চলবে, তার সমপরিমাণ ছওয়াব তার আমল নামায় লিখে দেওয়া হয়। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি হেদায়াতের দিকে আহ্বান জানায় তার জন্য সে পথের অনুসারীদের ছওয়াবের অনুরূপ ছওয়াব রয়েছে (ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৭৪; মিশকাত, হা/১৫৮)। **তৃতীয়ত,** নবী ﷺ-এর পূর্ব-পরের সকল পাপ আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি তোমাকে দিয়েছি স্পষ্ট বিজয়। যেন আল্লাহ তোমার পূর্বের ও পরের পাপ ক্ষমা করেন' (আল-ফাতহ, ৪৮/১-২)। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে: قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ 'তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে (ছহীহ বুখারী, হা/৪৯৫; ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৩)। অত্র কুরআন ও হাদীছ থেকে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, আল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ-এর সকল পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন। সুতরাং তিনি মানুষের ছওয়াবের প্রতি মুখাপেক্ষী নন।

বৈধ/অবৈধ

প্রশ্ন (২৪) : ইসলামে রূপচর্চা করার বিধান কী? কালো চেহারাকে ফর্সাকারী ক্রীম ব্যবহার করা যাবে কি?

-আসাদুল্লাহ
মহাদেবপুর, নওগাঁ।

উত্তর : রূপচর্চা মানুষের সহজাত ব্যাপার। ইসলাম এক্ষেত্রে বাধা প্রদান করে না। শুধু কিছু মূলনীতি বা শর্ত দিয়েছে। সেগুলো মেনে রূপচর্চা করাতে কোনো অসুবিধা নেই। ১. পুরুষের প্রসাধনী হবে রংমুক্ত ও ঘ্রাণযুক্ত। আর নারীর প্রসাধনী হবে রংযুক্ত ও ঘ্রাণমুক্ত (তিরমিযী, হা/২৭৮৭)। ২. যার মাধ্যমে সৃষ্টির আকৃতির পরিবর্তন হবে না। যেমন : ভ্রু প্লাক করা, দাঁত সরু করা, উল্কি আঁকা, নিজেকে লম্বা দেখানোর উদ্দেশ্যে উঁচু সেন্ডেল পরা ইত্যাদি (আন-নিসা, ৪/১১৯; ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৩১; ছহীহ মুসলিম, হা/২১২৫)। ৩. রূপচর্চা করে গায়রে মাহরামের সামনে যাবে না (নাসাঈ, হা/৫১২৬)। ৪. নারী-পুরুষ একে অন্যের বেশ ধারণ করবে না (ছহীহ বুখারী, হা/৫৮৮৫)। ৫. অমুসলিম ও বেহায়া নারীদের অনুকরণ করবে না (আবূ দাঊদ, হা/৪০৩১)। ৬. উক্ত প্রসাধনীতে ত্বক কিংবা স্বাস্থ্যের কোনো ক্ষতি না হওয়া (আল-বাকারা, ২/১৯৫)। ফর্সাকারী ক্রীম ব্যবহারে যেহেতু আকৃতির মৌলিক পরিবর্তন হয় না, বরং তা স্বাভাবিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির অংশ, তাই তা ব্যবহারে শারঈ কোনো অসুবিধা নেই। তবে যদি তা ত্বক কিংবা শরীরের কোনো ক্ষতি করে, তাহলে তা থেকে অবশ্যই বিরত থাকা জরুরী। কারণ নিজের কিংবা অন্যের কোনো ক্ষতি ডেকে আনা নিষিদ্ধ (ইবনু মাজাহ, হা/২৩৪০)।

প্রশ্ন (২৫) : আমরা তিন ভাই। আমার বাবা-মায়ের কোনো কন্যা সন্তান না থাকায় ছোট অবস্থায় একটি মেয়েকে দত্তক নেয়। মেয়েটির প্রকৃত বাবা-মায়ের পরিচয় মেয়েটির নিকট গোপন করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো- মেয়ে দত্তক নেওয়া ইসলামি শরীয়াতে কতুটুকু জায়েয? আর এইভাবে তার প্রকৃত বাবা-মায়ের পরিচয় গোপন করা জায়েয হবে কি? না হলে এক্ষণে করণীয় কী?

-মুশফিক
গাইবান্ধা।

উত্তর : শরীয়তে (তাবান্না) অন্যের সন্তানকে সন্তান হিসাবে গ্রহণ করে লালন-পালন করা বৈধ রয়েছে। যেমন: যায়েদ ইবনু হারেছাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ছেলে বানিয়ে ছিলেন। তবে, তার নিকট তার প্রকৃত বাবা-মায়ের পরিচয় গোপন করা যাবে না। বরং বিষয়টি তাকে অবগত করতে হবে। কোনো সন্তানকে দত্তক নিলেও সে তার নিজ পিতাকে বাদ দিয়ে পালনকারী ব্যক্তিকে পিতা বলে ডাকতে পারবে না। উল্লেখিত পদ্ধতিতে সন্তান দত্তক নেওয়ার মাধ্যমে দুইটি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। **এক.** মেয়ের নিকট তার পিতা-মাতার পরিচয় গোপন করা। **দুই.** ইচ্ছাকৃতভাবে তার পরিচয় গোপন করার মাধ্যমে তার অধিকার কেড়ে নেওয়া। সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ 'যে ব্যক্তি জেনে-শুনে নিজ পিতাকে বাদ দিয়ে অন্যকে পিতা হিসাবে সম্বোধন করল, তার উপর জান্নাত হারাম' (ছহীহ বুখারী, হা/৬৭৬৬; ছহীহ মুসলিম, হা/৬৩)। এখন করণীয় হলো তার নিকট তার আসল বাবা-মায়ের পরিচয় স্পষ্ট করা। তবে দত্তক নেওয়া মেয়েকে দুগ্ধ পান না করিয়ে থাকলে, পালক পিতা, তার সন্তানসহ সকল গায়রে মাহরাম থেকে তাকে পর্দা করতে হবে।

প্রশ্ন (২৬) : বাড়িতে কলিংবেল লাগানো যাবে কি?

-শফিকুল ইসলাম
ফরিদপুর।

উত্তর : বাড়িতে কলিংবেল লাগানো যায়। তবে কলিংবেলে টোন হিসাবে সালাম ব্যবহার করতে হবে। কেননা এই মর্মে মহান আল্লাহ আদেশ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, হে মুমিনগণ, ‘তোমরা নিজদের গৃহ ছাড়া অন্য কারও গৃহে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না তোমরা অনুমতি নেবে এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম দেবে। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর (আন-নূর, ২৪/২৭)।

প্রশ্ন (২৭) : গোরস্থানের জন্য মোট ৫ শতাংশ জমি নির্ধারণ করা আছে। এখন সেখানে শুধুমাত্র জমির মূল মালিক যিনি তাকে দাফন করা আছে অর্থাৎ একটি কবর। অনেক জায়গা খালি পড়ে আছে। তাই খালি জায়গায় বড় ছেলে পানের বরজ করেছে। এমন অবস্থায় কবরস্থানে পানের বরজ করা জায়েয হবে কি?

-রায়হান
রাজশাহী।

উত্তর : প্রথমত, গোরস্থানের বৃহৎ খালি জায়গায় ফসল উৎপাদন করা যায়। এক্ষেত্রে গোরস্থান কমিটি সেখানে ফসল উৎপাদন করতে পারে বা বর্গা দিতে পারে। চাইলে দাতার সন্তানরা কমিটির নিকট হতে বর্গা নিতে পারে। তবে তা হতে প্রাপ্ত অর্থ গোরস্থানের উন্নয়নের কাজেই ব্যবহার করতে হবে। দাতার ছেলে-সন্তানরা একাই ভোগ করতে পারবে না। **দ্বিতীয়ত,** যদি কবরস্থানে অধিক কবর থাকে এবং ফসল উৎপাদনের জন্য কবরের উপর দিয়ে যাতায়াত করতে হয়, সেখানে বসতে হয় তাহলে সে কবরস্থানে ফসল উৎপাদন করা যাবে না। কেননা রাসূল ﷺ কবরের উপর এবং কবরের মাঝে বসতে, ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। এ মর্মে রাসূল ﷺ বলেন, لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُوْرِ، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا ‘তোমরা কবরের উপর বসবে না এবং সেদিকে ফিরে ছালাত আদায় করবে না’ (ছহীহ মুসলিম, হা/৯৭২; মিশকাত, হা/১৬৯৮)। অন্যত্র তিনি বলেন, لاَ تَجْلِسُوا عَلِى الْقُبُوْرِ وَلاَ تُصَلُّوا عَلَيْهَا ‘তোমরা কবরের উপর বসবে না এবং এর উপর ছালাত আদায় করবে না’ (মুসনাদে আহমাদ, হা/১৭২৫৫)। نَهَى أَنْ يُصَلِّىَ بَيْنَ الْقُبُوْرِ ‘রাসূল ﷺ কবরের মাঝে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন’ (ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/১৬৯৮)। তবে যদি জমিটা পারিবারিক কবরস্থান হিসাবে নির্ধারণ করা থাকে, তাহলে কবরের পূর্ণ হেফাযত করে তার সন্তানরা পানের বরজসহ চাষাবাদ করতে পারে।

বৈধ/অবৈধ-ভ্রমণ

প্রশ্ন (২৮) : ভ্রমণ সম্পর্কে ইসলাম কী বলে? আমি যদি আমার স্ত্রীকে নিয়ে কক্সবাজার বেড়াতে যাই এবং ২ রাত থেকে আসি তাহলে কি এটা আমাদের জন্য জায়েয হবে? না-কি অযথা টাকা অপচয় হিসাবে গণ্য হবে। কারণ সেখানে বেড়ানো ছাড়া আমাদের কোনো কাজ নেই ।

-মুমিনুজ্জামান
জামালপুর।

উত্তর : ইসলাম শিক্ষণীয় ভ্রমণের বিষয়ে উৎসাহ দিয়েছে। যেই ভ্রমণে আল্লাহর সৃষ্টির মহিমা উপলব্ধি করা যায়, আল্লাহর অবাধ্য বান্দাদের পরিণাম দর্শনের মাধ্যমে মনের মধ্যে তাকওয়া বৃদ্ধি পায়, এমন ভ্রমণ প্রশংসনীয় (আল ফাতির, ৩৫/২৭ ও ২৮)। এমন ভ্রমণের বিষয়ে আল্লাহ আদেশ করেছেন (আল আন'আম, ৬/১১)। দ্বিতীয়ত, যে ভ্রমণে নিছক আনন্দ হয়, আল্লাহভীতির পরিবর্তে শুধু দুনিয়াবী চাকচিক্য দেখা হয়, নারীদের নগ্ন-অর্ধ নগ্ন চলাফেরা ও নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা দর্শন হয়, ঢোল-তবলা বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয়, এমন ভ্রমণ আল্লাহ নির্দেশিত ভ্রমণ নয় এবং এসব ভ্রমণের পক্ষে আল্লাহর আয়াত দিয়ে দলীল পেশ করাও উচিত নয়। এমন স্থানে জরুরী প্রয়োজন ছাড়া সস্ত্রীক কিংবা একাকী ভ্রমণ করা অনুচিত। কারণ এতে চোখের যেনা হয়। দুনিয়ার মোহ, বেহায়াদের অনুকরণ ইত্যাদির প্রবণতা তৈরি হয়। সর্বোপরি এর মাধ্যমে অন্যায় ও পাপকর্মের আয়োজকদের সহযোগিতা করা হয়, যা শরীআতে নিষিদ্ধ (আল মায়েদা, ৫/২)। মনে হতে পারে, তাহলে কি ভালো মানুষেরা ঘরের ভিতরে বসে থাকবে? এর জবাব স্বয়ং রাসূল ﷺ দিয়েছেন। উক্ববা ইবনু আমের রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমি রাসূল ﷺ-কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! নাজাত পাওয়ার উপায় কী? তিনি বললেন, ‘জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করো, বাড়িতে অবস্থান করো, আর ভুল হলে কান্না করো’ (তিরমিযী, হা/২৪০৬)।

বিদ'আত- কবর যিয়ারত, দরূদ

প্রশ্ন (২৯) : আমরা কবর যিয়ারতের সময় সূরা ফাতিহা, সূরা ইখলাছসহ আরো কিছু সূরা ও দরূদ পাঠ করি। শেষে মোনাজাত করি। এই পদ্ধতি কি শরীয়ত সম্মত? যদি না হয় তাহলে, ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী কবর যিয়ারতের নিয়ম জানালে উপকৃত হব।

-শামসুল আলম ভূঁইয়া
উত্তরখান, ঢাকা-১২৩০।

উত্তর : প্রশ্নোল্লেখিত পদ্ধতিতে কবর যিয়ারত যা বিভিন্ন মহলে প্রচলিত রয়েছে ইসলামি শরীয়তে এর কোনো ভিত্তি নেই। বরং এটা সুস্পষ্ট বিদ'আত। আর যা বিদ'আত তা অবশ্য বর্জনীয় এবং আল্লাহর নিকট প্রত্যাখ্যাত। রাসূল ﷺ বলেন, مَنْ أَحْدَثَ

فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ ‘যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনে নতুন কিছু আবিষ্কার করল যা এর অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত’ (ছহীহ বুখারী, হা/২৬৯৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮)। অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ‘যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করল, যার ব্যাপারে আমার কোনো নির্দেশনা নেই তা প্রত্যাখ্যাত’ (ছহীহ বুখারী, হা/১৭১৮)। **কবর যিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি:** ক্বিবলার দিকে মুখ করে নিম্নের দু’আটি পাঠ করবে।

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَلاَحِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. ‘হে কবরবাসী মু’মিন ও মুসলিমগণ! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। ইনশা-আল্লাহ অবশ্যই আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হচ্ছি। আমরা আমাদের ও তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি’ (ছহীহ মুসলিম, হা/৯৭৪; মিশকাত, হা/১৭৬৪)। তারপর নিম্নের দু’আটিও পড়তে পারে। اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ ». (ছহীহ মুসলিম, হা/২২৭৬)। এছাড়াও চাইলে একাকী দাঁড়িয়ে বা হাত তুলে আল্লাহর নিকট দু’আ প্রার্থনা করতে পারে (তিরমিযী, হা/৩৫৫৬)।

প্রশ্ন (৩০) : “আল্লাহুমা ছল্লি ওয়া সাল্লিম আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ” এটা কি কোনো দরূদ?

-ফারজানা শেখ রিমকি
দিনাজপুর।

উত্তর : প্রশ্নোল্লিখিত দরূদটি নবী ﷺ-এর শেখানো কোনো দরূদ নয়। নবী ﷺ-এর শেখানো উত্তম দরূদ হলো দরূদে ইবরাহীম যা আমরা ছালাতে পাঠ করে থাকি। আব্দুর রাহমান ইবনু আবূ লায়লা (রাহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেন, একবার আমার সঙ্গে কা’ব ইবনু উজরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাক্ষাত হলো। তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে একটি হাদিয়া দেব না। তা হল এই যে, একদিন নবী ﷺ আমাদের নিকট বেরিয়ে আসলেন, তখন আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনাকে কেমন করে সালাম দেব, আমরা আপনার উপর দরূদ কীভাবে পড়ব? তিনি বললেন, তোমরা বলবে, اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (ছহীহ বুখারী, হা/৩৩৭০; ছহীহ মুসলিম, হা/৪০৫)। অত্র দরূদটি নবী ﷺ-এর শেখানো দরূদ। সুতরাং দরূদ হিসাবে এটি পড়াই উত্তম। হাদীছে ইহা ব্যতীত ভিন্ন শব্দ দ্বারাও দরূদ সাব্যস্ত হয়েছে- যেমন: السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ (ছহীহ বুখারী, হা/৮৩১)। সুতরাং রাসূল ﷺ-এর শেখানো পদ্ধতিতে দরূদ পড়া উচিত। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করবেন (ছহীহ মুসলিম, হা/৪০৮; মিশকাত, হা/৯২১)।

পারিবারিক বিধান- বিবাহ-তালাক

প্রশ্ন (৩১) : আমি ২০১৭ সালে স্থানীয় চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে আমার স্ত্রীকে খোলা তালাক দেই। তালাকের আগেই আমি দ্বিতীয় বিয়ে করেছিলাম। বেশ কিছুদিন পর আমার দ্বিতীয় স্ত্রী শারিরিক অসুস্থতার কারণে সংসার ছেড়ে চলে যায়। পরবর্তীতে আমি প্রথম স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার জন্য আলেমদের নিকট গেলে তারা বলেন, আগের স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে হলে তাকে অন্যত্র বিবাহ দিতে হবে। আমার চাচি শাশুড়ি তার মেয়ের জামাইয়ের সাথে তার বিয়ে দেন এবং সে একদিন পর তাকে তালাক দিয়ে দেয়। তিন মাস পর আমি আবার তাকে নতুনভাবে মোহরানা দিয়ে বিয়ে করি। আমার জানার বিষয় হলো- কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে আমার বর্তমান সংসার বৈধ না-কি অবৈধ?

-শাহ আলমগীর শরীফ
শেরপুর, ময়মনসিংহ।

উত্তর : আপনার বর্তমান স্ত্রী বৈধ। তবে আলেমদের উক্ত ফতওয়া উদ্ভট ও ভিত্তিহীন। কারণ আপনি আপনার খোলাকৃত প্রথম স্ত্রীকে নতুন বিবাহ ও মোহরের মাধ্যমে সরাসরি ফেরিয়ে নেওয়াই শরীয়ত সম্মত ছিল। কেননা খোলা কোনো তালাক নয়। বরং তা বিবাহ বিচ্ছেদ। আর আলেমদের ফতওয়া অনুযায়ী চাচী শাশুড়ীর মেয়ের জামাইয়ের সাথে একদিনের চুক্তি বিবাহ দেওয়া হারাম হয়েছে। কেননা পূর্বের স্বামীর জন্য বৈধ করার চুক্তি বিবাহ (হিল্লা) প্রথা ইসলামে ঘৃণিত ও অভিশপ্ত কাজ। উক্ববা ইবনু আমের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘আমি কি তোমাদের ভাড়াটে পাঁঠা সম্পর্কে জানাব না? সেই পাঁঠা হলো হিল্লাকারী। আর আল্লাহ হিল্লাকারী ও যার জন্য হিল্লা করা হয় উভয়কে অভিশাপ করেছেন’ (ইবনু মাজাহ, হা/১৯৩৬)।

প্রশ্ন (৩২) : স্বামী-স্ত্রীর মোবাইলে কথা বলার সময় ঝগড়া হয়। ফোন কেটে দিয়ে স্বামী মেসেজে লিখে পাঠান ‘তোমাকে এক, দুই, এবং তিন তালাক। প্রশ্ন হলো, এই তালাক কার্যকর হয়েছে কি? কার্যকর হয়ে থাকলে করণীয় কী?

-ইকবাল হোসেন সুমন
চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তর : রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘তিনটি কাজ এমন যা বাস্তবে বা ঠাট্টাচ্ছলে করলেও তা বাস্তবিকই ধর্তব্য। আর তা হলো- বিবাহ, তালাক ও স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ’ (আবূ দাউদ, হা/২১৯৪; তিরমিযী, হা/১১৮৪)। সুতরাং মোবাইলে মেসেজ করে হোক কিংবা

সরাসরি; স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক দেয় তাহলে সে তালাক কার্যকর হবে। অতএব প্রশ্নোল্লেখিত পদ্ধতির তালাক নিঃসন্দেহে কার্যকর। তবে তা তিন তালাক নয় বরং এক তালাক হিসাবে গণ্য। কেননা স্বামী স্ত্রীকে এক সাথে তিন তালাক দিলে তা শরীয়তে এক তালাক হিসাবে বিবেচিত হয়।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَحَزِنَ عَلَيْهَا فَرَدَّهَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ: إِنَّهَا وَاحِدَةٌ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, আবু রুকানা নামে একজন লোক তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ে। তখন নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার স্ত্রীকে তার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে বলেন, এটা এক তালাক হয়েছে। (মুসনাদে আহমাদ, হা/২৩৮৭ হাদীছ ছহীহ; বায়হাক্বী, হা/১৪৭৬৪)। তাই কেউ যদি একসাথে তিন তালাক দিয়ে দেয় তাহলে সেটা এক তালাক বলে গণ্য হবে। আর উক্ত স্বামী তার স্ত্রীকে তিন মাসের মধ্যে নতুনভাবে বিবাহ পড়ানো ছাড়াই ফিরিয়ে নিতে পারবে। যদি তিন মাস অতিক্রান্ত হয়ে যায় তাহলে নতুনভাবে মোহরানা ধার্য করে বিবাহ পড়ানোর মাধ্যমে ফিরিয়ে নিতে পারবে। সুতরাং আপনি চাইলে আপনার স্ত্রীকে উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে ফিরিয়ে নিতে পারেন।

প্রশ্ন (৩৩) : কিছুদিন আগেই ইউটিউবে শুনলাম- কেউ যদি স্ত্রীকে ছেড়ে দিলাম বা তোমাকে রাখব না বলে তাহলে তালাক হয়ে যাবে। চার বছর আগে আমার পরিবারের সদস্যদের সাথে আমার স্ত্রীর ঝগড়া হয়, সে আমাকে বলে তোমার পরিবার থেকে আমি মুক্তি চাই। তখন আমি বলছিলাম, তোমার বাবা-মাকে ডেকে এনে মুক্তি নিয়ে চলে যাও। তুমি আমাকে নিয়ে সুখী হতে না পারলে অন্য কাউকে বিয়ে করে সুখী হও। সেই স্বাধীনতা তোমাকে দিলাম। আমার স্ত্রী যাইনি। এটা কি তালাক বলে গণ্য হবে? আমি আগে জানতাম তালাক দিতে তালাক শব্দটা বলতে হয়।

-আব্দুল হান্নান
মক্কাপ্রবাসী।

উত্তর : প্রশ্নোল্লেখিত ক্ষেত্রে তালাক হয়নি। কেননা এখানে স্ত্রীকে বাবা-মাকে উপস্থিত করে পৃথক হওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু স্ত্রী সেই সুযোগ গ্রহণ করেনি। বিধায় এটা তালাক হয়নি। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর স্ত্রীগণ তার সামর্থ্যের বেশি খোরপোষের দাবি জানালে তিনি তাদের তার কাছে থাকার অথবা পৃথক হয়ে যাওয়ার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। কিন্তু কোনো স্ত্রী তা গ্রহণ করেনি। আর সেটাকে তালাক হিসাবে গণ্য করাও হয়নি (ছহীহ বুখারী, হা/২৪৬৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১৪৭৫)।

প্রশ্ন (৩৪) : কোনো নারী তার অভিভাবককে না জানিয়ে গোপনে কাজী অফিসে বিয়ে করে। তারপর নিজের ভুল বুঝতে পেরে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করে। তাহলে কি তার দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রথম স্বামী থেকে তালাক ও ইদ্দতের প্রয়োজন আছে?। উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণের পূর্বে প্রথম স্বামীর সাথে তিন মাস আগে দাম্পত্য সম্পর্ক হয় ।

-রিজু আহমেদ
বিরল, দিনাজপুর।

উত্তর : অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করলে বিয়ে হবে না; বরং তাদের তিন মাসের পারস্পারিক সম্পর্ক ব্যভিচার বলে গণ্য হবে। যখন বিয়েই হয় নাই তখন তালাক আর ইদ্দতের কোনো প্রশ্নই হয় না। আবূ মূসা আল-আশআরী বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘ওয়ালি ছাড়া বিবাহ শুদ্ধ হবে না’ (আবূ দাঊদ, হা/২০৮৫; তিরমিযী, হা/১১০১)। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘যে মহিলা তার ওয়ালির অনুমতি ব্যতীত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে, তার বিবাহ বাতিল বাতিল, তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল...’ (তিরমিযী, হা/১১০২; মিশকাত, হা/৩১৩১)। সুতরাং বর্তমানে যেহেতু যেনার হদ বাস্তবায়ন করার কোনো ব্যবস্থা নেই, সেহেতু পূর্বের অপকর্মের জন্য আল্লাহর নিকট খালেছ অন্তরে তওবা করে প্রথম স্বামী থেকে তালাক নেওয়া ও ইদ্দত পালন করা ছাড়াই পরের (মেয়ে অভিভাবকের সম্মতিতে হয়ে থাকলে) বৈধ স্বামীর সাথে ঘর সংসার করতে পারে। এতে পূর্বের স্বামী থেকে তালাক নেওয়া বা ইদ্দত পালন করার কোনো প্রয়োজন নেই।

ইবাদত- দাওয়াহ

প্রশ্ন (৩৫) : আল-ইতিছাম পত্রিকাটি অমুসলিম তথা হিন্দুদের পড়তে দেওয়া যাবে কি?

-মো. আব্দুল গফুর
জিপিও ৯০০০, খুলনা।

উত্তর : পড়তে দেওয়া যাবে (ছহীহ বুখারী, হা/৪৫৫৩)। এতে কোনো সমস্যা নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দেহইয়া কালবী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) -র মাধ্যমে খ্রিস্টান বাদশা হেরাক্লিয়াসের নিকট দাওয়াত পত্র পাঠিয়ে ছিলেন। সে দাওয়াত পত্রে কুরআনের আয়াতও লেখা ছিল (ছহীহ বুখারী, হা/৪৫৫৩)। আল-ইতিছাম পত্রিকার উদ্দেশ্য শুধু মুসলিমের নিকট দ্বীন প্রচার নয় বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে- ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা, ইসলামের সৌন্দর্য, মুসলিম অমুসলিম, আস্তিক, নাস্তিকসহ সকল চিন্তাধারার মানুষের নিকট তুলে ধরা। যাতে তারা এর মাধ্যমে সঠিক ও মনোনীত ধর্ম ইসলামকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং অমুসলিমকেও এই পত্রিকা পড়তে দেওয়া যায় এবং দেওয়া উচিত। এতে দ্বীন প্রচারে সহযোগিতার কারণে ছওয়াব পাওয়া যাবে। ইনশা-আল্লাহ!

হদ্দ/শাস্তি- যেনা-ব্যভিচার

প্রশ্ন (৩৬) : আমি অনেক বড় ভুল করেছি। ৫ বছর ধরে একটি মেয়ের সাথে আমার অবৈধ সম্পর্ক। আমি আপনার বক্তব্য শুনে তওবা করে নিজেকে শোধরানোর চেষ্টা করছি এবং মেয়েটির সাথে সব ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করেছি। কিন্তু বর্তমানে মেয়েটি আমায় বিয়ের জন্য প্রচুর পরিমাণে চাপ দিচ্ছে। অপর দিকে আমার অভিভাবকগণ ঐ মেয়ের সাথে কোনোভাবেই বিয়ে দিতে রাজি নয়। কিন্তু মেয়েটি আপনার একটি বক্তব্যের কিছু অংশ আমার কাছে পাঠিয়েছে। যেখানে বলা আছে- যার সাথে যেনা হয়েছে সে তাকে বিয়ে করতে বাধ্য। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে, ছেলে-মেয়ে যেনায় লিপ্ত হওয়ার পর যদি দুইজনের একজন বিবাহ করতে সম্মত না হয় তাহলেও কি পরস্পর বিবাহ করতে বাধ্য?

-আব্দুর রহমান
দূর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তর : বিবাহের পূর্বে নারী-পুরুষের সকল সম্পর্ক হারাম। সুতরাং তাদের উপর হদ্দ (যেনার নির্ধারিত শাস্তি) প্রয়োগ করতে হবে (আন-নূর, ২৪/২)। এই শাস্তি কার্যকরের দায়িত্ব সরকারের। অভিভাবকের সম্মতিতে তাদের মাঝে বিবাহ দেওয়া যায়। মহান আল্লাহ বলেন, 'ব্যভিচারী কেবল ব্যভিচারিণী অথবা মুশরিকা নারীকে ছাড়া বিয়ে করবে না এবং ব্যভিচারিণীকে কেবল ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ছাড়া বিয়ে করবে না। আর মু'মিনদের উপর এটা হারাম করা হয়েছে' (আন-নূর, ২৪/৩)। তবে তাদের মাঝে জোরপূর্বক বিবাহ দেওয়া যাবে না। উবায়দুল্লাহ ইবনু ইয়াযিদ (রহিমাহুল্লাহ) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, একজন ছেলে একজন মেয়ের সাথে অপকর্ম করল। অতঃপর উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন মক্কায় আগমন করলেন তখন তার সামনে এই মামলাটি পেশ করা হলো। তিনি তাদের দুইজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, তারা দুইজন এই অপকর্মের স্বীকারক্তি প্রদান করল। তিনি তাদের দুইজনকে (যেনার শাস্তি) বেত্রাঘাত করলেন এবং তাদেরকে একত্রিত করার (বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার) আশা ব্যক্ত করলেন। ছেলেটি তার এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল (মুসনাদ আশ-শাফেঈ, হা/১৩৮৬; সুনানুল কুবরা, হা/১৩৬৫৩)।

প্রশ্ন (৩৭) : আমি একজন যেনাকারী অনেকবার যেনা করেছি। বর্তমানে আল্লাহর নিকট জবাবদিহীতার ভয় আমার অন্তরকে প্রকম্পিত করে। প্রশ্ন হলো- আমার ক্ষমা পাওয়ার উপায় কী? কী করলে আমি ক্ষমা পেতে পারি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
নিলফামারী।

উত্তর : যেনা অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ। তাই এই মর্মে ইসলামের চূড়ান্ত বিধান হচ্ছে, যদি কোনো অবিবাহিত পুরুষ বা মহিলা ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাহলে তাকে একশ' বেত্রাঘাত করতে হবে এবং পুরোপুরি এক বছর দেশান্তর করতে হবে (আন-নূর, ২; ছহীহ বুখারী, হা/১৬৯০)। আর যদি কোনো বিবাহিত পুরুষ বা মহিলা ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাহলে তাকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করতে হবে (ছহীহ বুখারী, হা/৬৮৭৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১৬৭৬)। আর এই বিধান ক্বায়েম করবে ইসলামি রাষ্ট্রের শাসক। তবে উল্লেখিত ব্যক্তিকে এই অবস্থায় একনিষ্ঠ তওবা ও বেশি বেশি ইস্তেগফারের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে (আল-ফুরক্বান, ২৫/৬৮-৭১)। আর আল্লাহ তা'আলা চাইলে তার এই তওবা কবুল করে ক্ষমা করে দিতে পারেন (ছহীহ বুখারী, হা/৪৮৯৪)। মহান আল্লাহ বলেন, 'আপনি বলুন, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর বাড়াবাড়ি করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি অতি ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু' (আয-যুমার, ৩৯/৫৩)।

হালাল-হারাম

প্রশ্ন (৩৮) : জমি বন্ধক নিয়ে তাতে উৎপাদিত ফসল ভোগ করলে ইবাদত কবুল হবে কি?

-সৌরভ
লালমনিরহাট।

উত্তর : ঋণ দেওয়া সম্পদের নিরাপত্তার জন্য যে সম্পদ ঋণদাতার মালিকানায় সোপর্দ করা হয়, তাই বন্ধক (আল বাক্বারা, ২৮৩)। বন্ধকে রাখা সম্পদ ঋণদাতার ভোগের জন্য নয়। বরং তা শুধু তার সম্পদের নিরাপত্তার জন্য। তাই ঋণদাতা উক্ত সম্পদ ভোগ করতে পারবে না। কারণ 'যে ঋণে লাভ নিয়ে আসে, সেটাই সূদ' (মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, হা/২০৬৯০; সুনানে কুবরা, বায়হাক্বী, হা/১০৯৩৩)। উল্লেখ্য যে, বন্ধকের সম্পদ যদি এমন হয় যে, তার পিছনে খরচ করা লাগে, যেমন- গরু, ছাগল, উট ইত্যাদি, তাহলে যতটুকু খরচ করবে, ততটুকু তার থেকে উপকার গ্রহণ করতে পারে। অর্থাৎ প্রাণীকে খড়-ঘাস খাওয়াবে, তার বিনিময়ে সে প্রাণীর দুধ খাবে বা তার পিঠে আরোহণ করবে (ছহীহ বুখারী, হা/২৫১২; মিশকাত, হা/২৮৮৬)। খরচের চেয়ে বেশি উপকার গ্রহণ করলে তা সূদ বলে গণ্য হবে। দুগ্ধদানকারী বকরী বন্ধক গ্রহণকারী সম্পর্কে ইবরাহীম নাখাঈ বলেন, شَرِبَ الْمُرْتَهِنُ مِنْ لَبَنِهَا بِقَدْرِ ثَمَنِ عَلَفِهَا فَإِنِ اسْتَفْضَلَ مِنَ اللَّبَنِ بَعْدَ ثَمَنِ الْعَلَفِ فَهُوَ رِبًّا 'সে তার খড়-ঘাসের খরচ সমপরিমাণ দুধ পান করবে। যদি খড়-ঘাসের মূল্যের চেয়ে বেশি দুধ গ্রহণ করে, তাহলে তা সূদ হবে' (ফাতহুল বারী, ৫/১৪৪; নায়লুল আওত্বার, ৫/২৭৯; তুহফাতুল আহওয়াযী, ৪/৩৮৭)। তাই বন্ধকে নেওয়া জমিতে উৎপাদিত সম্পূর্ণ ফসল ভোগ করা হারাম। এই ফসল খেয়ে ইবাদত কবুল হবে না (ছহীহ মুসলিম, হা/১০১৫)। তবে

যদি চাষাবাদের খরচ হিসাবে সমাজে প্রচলিত আধি বা বর্গা হিসাবে ফসল নিয়ে অবশিষ্ট ফসল জমির মূল মালিককে ফেরত দেয় কিংবা সেই ফসলের মূল্য সমপরিমাণ টাকা ঋণ থেকে মওকূফ করে দেয়, তাহলে তা হালাল হবে এবং তাতে ইবাদত কবুলে কোনো বাধা থাকবে না।

প্রশ্ন (৩৯) : আমার স্ত্রী সরকারি নার্স, সে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত পড়ে, আমিও পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত পড়ি। এখন প্রশ্ন হলো তার নার্স এর চাকুরী করা ঠিক হচ্ছে কি?

-চান মিয়া
রংপুর।

উত্তর : ইসলামে পর-পুরুষের সাথে সহবস্থান করে নারীর জন্য চাকুরীসহ কোনো কাজ করা বৈধ নয় যদিও তা পূর্ণ হিজাবসহ হয়ে থাকে। কেননা আল্লাহর রাসূল ﷺ নারী-পুরুষের সহবস্থানকে সরাসরি নাকচ করেছেন। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'কোনো (গায়রে মাহরাম) নারী-পুরুষ যেনো নির্জনবাস না করে। কেননা (এমন হলে) তাদের তৃতীয়জন হবে শয়তান' (মিশকাত, হা/৩১১৮)। অত্র হাদীছ প্রমাণ করে যে, গায়রে মাহরাম নারী-পুরুষের সহবস্থান স্পষ্ট হারাম। তবে, নারীদের পৃথক অবস্থানের ব্যবস্থা থাকলে চাকুরী করতে পারে।

হালাল-হারাম-চাকুরী

প্রশ্ন (৪০) : বাজার থেকে যবেহ করে আনা মুরগি। বিসমিল্লাহ বলে যবেহ করা হয়েছে কি-না আমি নিশ্চিত জানি না। কিংবা জানার কোনো উপায়ও নেই। এক্ষেত্রে ঐ গোশত খাওয়ার বিধান কি?

-ইসরাত জাহান
করিবহাট, নোয়াখালী।

উত্তর : যদি স্পষ্ট জানা যায় যে, প্রাণীটি কোনো অমুসলিম যবেহ করেছে বা কোনো মুসলিম বিসমিল্লাহ না বলে যবেহ করেছে তাহলে ঐ প্রাণীটি খাওয়া যাবে না। আর যদি স্পষ্ট জানা না যায় তাহলে খাওয়ার সময় বিসমিল্লাহ বলে খেতে হবে। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের ক্বওমের লোকেরা জাহিলিয়্যাতের যুগের খুবই নিকটবর্তী (অর্থাৎ তারা কেবলই ইসলাম কবুল করেছে)। তারা আমাদের কাছে গোশত নিয়ে আসে, অথচ আমরা জানি না, তারা যবেহের সময় ঐ পশুর উপর 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করেছে কি-না? আমরা কি এ গোশত থেকে ভক্ষণ করব? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা 'বিসমিল্লাহ' বলে তা ভক্ষণ কর। (আবূ দাঊদ, হা/২৮২৯)।

অর্থনৈতিক- ব্যবসা-বাণিজ্য

প্রশ্ন (৪১) : ফেসবুক অথবা ইউটিউব থেকে এডসেন্স এর মাধ্যমে ইনকাম করা যাবে কি-না? অনেক সময় অনলাইনে ব্রাউস করার সময় অনিচ্ছা সত্ত্বেও অশ্লীল ছবি চোখে পড়ে এক্ষণে করণীয় কী?

-মো. আবু জোহা
খিলক্ষেত, ঢাকা।

উত্তর : এডসেন্স হলো গুগল কর্তৃক পরিচালিত একটি সিস্টেম। যেখানে একজন ব্যক্তি বিভিন্ন রকম ছবিযুক্ত বিজ্ঞাপন আপলোড করে থাকে। এরপর যত মানুষ তা দেখে থাকে সে অনুযায়ী তার একাউন্টে ডলার যুক্ত হয়। এক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি যদিও শরীয়া সম্মত বিজ্ঞাপন আপলোড করতে চাই তবুও তার সামনে বিভিন্ন রকম খারাপ ছবি চলে আসে বিধায় তার কর্তব্য হবে এমন কাজ করা হতে বিরত থাকা। কারণ এর মাধ্যমে তার চোখের যেনা হয়ে থাকে। রাসূলের বাণী, 'চোখ যেনা করে থাকে আর তার যেনা হলো দৃষ্টি দেওয়া, মুখ যেনা করে থাকে আর তার যেনা হলো কথা বলা, হাত যেনা করে থাকে আর তার যেনা হলো স্পর্শ করা, পা যেনা করে থাকে আর তার যেনা হলো চলা এবং লজ্জাস্থান তা সত্যায়ন করে বা মিথ্যায় পরিণত করে' (ছহীহ বুখারী, হা/৬২৪৩; মিশকাত, হা/৮৬)। অনুরূপভাবে আল্লাহ সৎ আমল করার জন্য বলেছেন। আল্লাহর বাণী, 'হে রাসূলগণ ! তোমরা পবিত্র জিনিস হতে খাও এবং সৎ আমল কর' (আল-মুমিনূন, ২৩/৫১)।

প্রশ্ন (৪২) : Youtube -এর মত App বানালে কি গুনাহ হবে? কারণ এখানে ভালো খারাপ দুটোই থাকে। এর জন্য কি আমি দায়বদ্ধ থাকব?

-মুবাশ্বিরা বুশরা
পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : যে সফটওয়্যারের মধ্যে ভালো-মন্দ দুটো দিকই আছে, হুবহু তার মতোই অন্য সফটওয়্যার বানানো উচিত নয়। কারণ তাতে ভালোর সাথে সাথে মন্দেরও প্রচার হয়। তবে এমন অ্যাপ দিয়ে যদি প্রচলিত সফটওয়্যারের মন্দ দিকগুলো কমানোর ব্যবস্থা করা যায়, অথবা কোনো সফটওয়্যারের ইনকাম অমুসলিমদের হাতে চলে যাওয়া রোধ করা যায়, তাহলে মুসলিম উম্মাহর স্বার্থে এমন সফটওয়্যার বা অ্যাপ বানানো যেতে পারে এবং ইহা সৎকর্মে সহযোগিতার শামিল হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পরের সহযোগিতা কর। মন্দকর্ম ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পরের সহযোগিতা করো না। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ আযাব প্রদানে কঠোর' (আল-মায়েদা, ৫/২)।

প্রশ্ন (৪৩) : ১. মোবাইলে ব্যবহারের জন্য তাফসীরুল কুরআন, হাদীছ, ইসলামিক বই ইত্যাদির Apps তৈরি করা যাবে কি? ২. যদি যায় তাহলে এই Appsগুলোতে বিভিন্ন হালাল জিনিসের এ্যাড শো করা বৈধ হবে কি।

-মুবাশ্বিরা, বুশরা
পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : হ্যাঁ, বানানো যাবে এবং হালাল জিনিসের অ্যাড শো করা যাবে। কেননা, মহান আল্লাহ তাঁর পথে মানুষকে ডাকার আদেশ করেছেন। আর এ দাওয়াত দানের মাধ্যম বিভিন্ন হতে পারে। যেমন, ১. দলীল ভিত্তিক সুন্দর বক্তব্য উপস্থানের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকা। মহান আল্লাহ বলেন, 'ঐ ব্যক্তির চেয়ে কে উত্তম বাচনিক বক্তা হতে পারে যে আল্লাহর পথে ডাকে এবং সৎ আমল করে' (হা-মীম সাজদা, ৪১/৩৩)। ২. ক্ষুরধার লেখনির মাধ্যমে ইসলামরে দাওয়াত সর্বত্র পৌঁছে দিতে হবে। চাই তা অনলাইনে হোক অথবা অফলাইনে হোক। সুলায়মান আ. রানী বিলকিসের শিরক মিশ্রিত রাজত্বের কথা হুদহুদ পাখির মাধ্যমে জানতে পেরে তাওহীদের দাওয়াত পত্র তার নিকট পাঠিয়ে ছিলেন (আন-নামল, ২৭/২৩-৩০)। নবী মুহাম্মাদ ﷺ তাওহীদের দাওয়াত পত্র বাদশাহ হিরাক্লিয়াসের নিকট দিহইয়াতুল কালবী رضي الله عنه -এর মাধ্যমে পাঠিয়েছিলেন (ছহীহ বুখারী, হা/৭)। এ থেকে বুঝা যায় দ্বীন প্রচারের জন্য অ্যাপ তৈরী করা যাবে। অপরপক্ষে, আল্লাহ তাআলা ব্যবসা হালাল এবং সূদ হারাম করেছেন (আল-বাক্বারা, ২/২৭৫)। আর যে জিনিস হারাম তার বেচা-কেনা বা বিনিময়ে মূল্য গ্রহন করাও হারাম। যেমন, যেনা করা হারাম এবং যেনা করে এর মূল্য গ্রহণ করা হারাম। আবূ মাসঊদ আল-আনছারী বলেন, রাসূল ﷺ কুকুরের ব্যবসা করে, পতিতাবৃত্তি করে ও গণকী করে মূল্য খেতে নিষেধ করেছেন (ছহীহ বুখারী, হা/২২৩৭; মিশকাত, হা/২৩২)। সুতরাং হালাল ব্যবসায়ে হালাল মাধ্যম গ্রহণ করাতে কোনো বাধা নিষেধ নেই। যেমন, বর্তমানে ইসলামি পত্রিকাগুলোতে বিভিন্ন কোম্পানির অ্যাড শো বা প্রচার করা হয়।

মৃত্যু

প্রশ্ন (৪৪) : মৃত্যু শয্যায় শায়িত মুমূর্ষ ব্যক্তিকে কোন দিকে করে শুইয়ে রাখতে হবে।

-শাহজালাল মিয়া
মাহিগঞ্জ, রংপুর।

উত্তর : মৃত্যু শয্যায় সায়িত মুমূর্ষ ব্যক্তি তার সুবিধামত শুয়ে থাকবে। এই ব্যাপারে শরীয়তে কোনো দিকনির্দেশনা নেই। এমন মুমূর্ষ ব্যক্তিকে উপস্থিত ব্যক্তিগণ তাওহীদের কালিমা لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ পাঠের তালক্বীন করবে। আবূ সাঈদ খুদরী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে মুমূর্ষদের **'লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহ'** এর তালকীন দাও (অর্থাৎ তার সামনে কালেমা পাঠ করতে থাক যেন সে শুনে আল্লাহকে স্মরণ করে) (ছহীহ মুসলিম, হা/৯১৬)।

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

প্রশ্ন (৪৫) : সৎ মায়ের প্রতি সৎ ছেলের কি কোনো দায়িত্ব আছে?

-মো. হামিদুর রহমান
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : হ্যাঁ, সৎমায়ের প্রতি সৎছেলের বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। তার সাথে সদাচণ করা, তার খোঁজ-খবর নেওয়া। আর তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিতে পারলে তো বড় ইহসান হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি বানী ইসরাঈলের নিকট থেকে পাক্কা ওয়াদা নিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করবে না, পিতা-মাতা, নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম ও মিসকীনদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে' (আল-বাক্বারা, ২/৮৩)। আপন মা, সৎ মা এরা হলো পিতার সবচেয়ে কাছের বন্ধু। আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ও পিতা-মাতার বন্ধু-বান্ধবের সাথে ভালো ব্যবহার প্রসঙ্গে একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। আবূ উসাইয়্যিদ আস-সাঈদী رضي الله عنه বলেন, আমরা রাসূল ﷺ -এর নিকট ছিলাম এমন সময় হঠাৎ করে বনূ সালামা গোত্রের জনৈক ব্যক্তি আসলেন। এসে বললেন, আল্লাহর রাসূল! পিতা-মাতা মৃত্যুর পর কোনো ভালো আচরণ বাকি থাকে কি যার দ্বারা আমি তাদের সাথে ভালো আচরণ করতে পারব। তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আছে! তুমি তাদের মৃত্যুর পর তাদের জন্য ক্ষমা চাইবে, তাদের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবে, তাদের সূত্র ধরে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে, তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সম্মান করবে' (আবূ দাঊদ, হা/৫১৪২; মিশকতা, হা/৪৯৩৬)।

সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য- আক্বীকা

প্রশ্ন (৪৬) : কোনো সন্তান যদি বুধবারের দিন মাগরিবের পরে জন্মগ্রহণ করে, তাহলে বুধবার তার আক্বীকার দিনের হিসাবের মধ্যে গণ্য হবে না-কি বৃহস্পতিবার থেকে দিন গণনা শুরু হবে?

-আঞ্জারুল ইসলাম
উত্তর দিনাজপুর , ওয়েস্ট বেঙ্গল, ভারত।

উত্তর : বৃহস্পতিবার থেকে দিন গণনা আরম্ভ হবে। কেননা আরবী তারিখ শুরু হয় সূর্য ডোবার পর থেকে। সুতরাং বৃহস্পতিবারে জন্ম ধরে ৭ম দিনে আক্বীকা করতে হবে। আবূ হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'তোমরা চাঁদ দেখে ছিয়াম ধরো এবং চাঁদ দেখে ছিয়াম ছেড়ে দাও। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে, শা'বান মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ করো' (ছহীহ বুখারী, হা/১৯০৯; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৮১)। উক্ত হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, আরবী তারিখের সম্পর্ক চাঁদের সাথে। আর চাঁদ যেহেতু মাগরিবের পর দেখা যায় সুতরাং আরবী তারিখের হিসাবও মাগরিবের পর থেকে আরম্ভ হবে।

অপসংস্কৃতি- দিবস উৎযাপন

প্রশ্ন (৪৭) : ইসলামে দিবস পালন করা হারাম। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে কেন আমরা ইদ উদযাপন করি?

-সাকিলা জাহান
সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তর : ইসলাম যে সময় যে আমল করার নির্দেশ দিয়েছেন তা সে সময় সে দিনে পালন করা ইবাদত। আর যে ব্যাপারে নিষেধ করেছেন তা বর্জন করাও ইবাদত। ইসলাম আগের সকল দিবস উদযাপন করাকে হারাম করে দুইটি দিনে আনন্দ করার আদেশ করেছেন। তাই দুই ইদ ব্যতীত সকল ধরনের উৎসব, দিবস উদযাপন হারাম সে যেই নামেই হোক না কেন?। এই মর্মে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ 'যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনের মধ্যে এমন নতুন বস্তু উদ্ভাবন করল যা তার মধ্যে নেই তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য' (বুখারী, হা/২৬৯৭; মিশকাত, হা/১৪০)। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ 'যে ব্যক্তি এমন আমল করল যার প্রতি আমার নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য (ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮)।

প্রশ্ন (৪৮) : কারো জন্মদিনে 'শুভ জন্মদিন' বলে শুভেচ্ছা জানালে কি তা শিরক হবে?

-আসিফ খান কসবা
আড়াইবারি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

উত্তর : কারো জন্মদিনে **'শুভ জন্মদিন'** বলা যাবে না। কেননা যত দিন, দিবস ও বার্ষিক আছে যার নযির ইসলামে নাই তার সবই বিজাতীয় অপসংস্কৃতি, যা মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করেছে। আর মুসলিমরা নিজেদের অজান্তেই তা নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি হিসেবে লালন-পালন করে থাকে। আর 'শুভ জন্মদিন' শব্দগুচ্ছ হলো ইংরেজি 'হ্যাপি বার্থ-ডে টু ইউ'-এর ভাবানুরূপ, যা ইউরোপ-আমেরিকার ইয়াহূদী-খ্রিস্টানদের থেকে মুসলিমদের মাঝে ঢুকে পড়েছে। মুসলিমদের জন্য এ বাক্য ব্যবহার করা বৈধ নয়। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোনো জাতির সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, সে তাদেরই দলভূক্ত' (আবূ দাউদ, হা/৪০৩১; মুসনাদে আহমাদ, হা/৫১১৪; মিশকাত, হা/৪৩৪৭;)।

হাদীছ

প্রশ্ন (৪৯) : 'মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর পিতা-মাতার মাগফিরাতের জন্য মহান আল্লাহর নিকট অনুমতি চেয়েছিলেন। আল্লাহ অনুমতি দেননি'। মর্মে বর্ণিত হাদীছের আরবী ইবারত, বাংলা অনুবাদ, অনুচ্ছেদ ও হাদীছ নাম্বারসহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মো. আব্দুল গফুর
জিপিও ৯০০০, খুলনা।

উত্তর : প্রশ্নে জানতে চাওয়া হাদীছটি আরবী ইবারত ও অনুবাদসহ উল্লেখ করা হলো:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ زَارَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ « اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ ».

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, একদা নবী ﷺ তাঁর মায়ের কবর যিয়ারত করতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন এবং তাঁর আশে-পাশে সকলকে কাঁদিয়ে তুললেন। (কারণ, জিজ্ঞাসা করা হলে) তিনি বললেন, 'আমি আল্লাহর নিকট আমার মায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুমতি চাইলাম। কিন্তু তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন না। অতঃপর আমি তাঁর নিকট তার কবর যিয়ারত করতে অনুমতি চাইলে তিনি তাতে অনুমতি দিলেন। সুতরাং তোমরা কবর যিয়ারত কর। কারণ, তা মরণকে স্মরণ করিয়ে দেয়' (ছহীহ মুসলিম, হা/৯৭৬; ইবনু মাজাহ, হা/১৬৩৯; অধ্যায়-৪৮ মিশকাত, হা/১৭৬২; 'ক্বর যিয়ারত অধ্যায়')।

প্রশ্ন (৫০) : জনৈক ইসলামিক স্কলার বলেছেন, কঠিন ফিতনার যুগে কোনো মুসলিম যদি কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী কোনো সুন্নাতের উপর আমল করে, তাহলে ৫০ জন শহীদের ছওয়াব পাবে। এ কথা কি ঠিক?

-রিজভী আহমেদ
চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর : জি; ফিতনার যুগে ছহীহ সুন্নাহর উপর আমলকারী ব্যক্তি ছাহাবীদের মধ্য হতে ৫০ জন ব্যক্তির সমপরিমাণ ছওয়াব অর্জন করবে মর্মে বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ (সিলসিলা ছহীহা, হা/৪৯৪; তিরমিযী, হা/৩০৫৮)। তবে ৫০ বা ১০০ জন শহীদের ছওয়াব পাবে মর্মে বর্ণিত হাদীছ নিতান্তই যঈফ (সিলসিলা যঈফা, হা/৩২৬)। কেননা এই বর্ণনার মাঝে মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উযরী নামক বর্ণনাকারী রয়েছে যিনি অপরিচিত এবং আব্দুল মজিদ ইবনু আব্দুল আযীয ইবনু আবী রাওয়াদ নামক একক বর্ণনাকারী রয়েছে, যার একক বর্ণনা অগ্রহণযোগ্য এবং হাসান ইবনু কুতায়বা নামক বর্ণনাকারী রয়েছে যিনি মাতরুকুল হাদীছ 'তার হাদীছ প্রত্যাখ্যাত' (মাজমা'উয যাওয়ায়েদ, 'আল-হায়ছামী', ১/১৭২ পৃ. লিসানুল মীযান, ২/২৪৬ পৃ.)।

সংশোধনী

মাসিক আল-ইতিছাম, ডিসেম্বর-২০২১ এর **'বিয়ে নিয়ে ভাবনা'** প্রবন্ধের দ্বিতীয় কলামে সূরা আল-ক্বাছাছের ২৫ নং আয়াতের টেক্সট হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾। যা মূলত ২৬ নং আয়াতের টেক্সট। তবে অনুবাদ ২৫ নং আয়াতেরই দেওয়া হয়েছে।

এই অনাকাঙ্ক্ষিত ভুলের জন্য আমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।